নানা কথা

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস

৬১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

এক টাকা

— প্রকাশক —
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ
প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস
৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাঘ—১৩৪১

প্রিণ্টার—শ্রীফণিভূষণ রায়
প্রকাশ প্রেস
৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশকের নিবেদন

বাংলার শিশু-সাহিত্যে সেই বৈজ্ঞানিক যুগ আসিতেছে, যাহা বস্তুনিষ্ঠ সত্যমূলক। ভূত-প্রেত বা পরীরাজ্যের কাহিনী বা উপকথায় যে কল্পনাবৃত্তির উন্মেষ হয় তাহা স্বপ্নমূলক—কাজেই এই অলীক স্বপ্নরাজ্যের উপাদানে শিশু-মন দৃঢ় হয় না, সমৃদ্ধ ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন হয় না। জাতীয় চরিত্র গোড়া হইতে দৃঢ় করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে, শিশু-সাহিত্যকেও এমন নূতন ছন্দে, নূতন ভঙ্গীতে ঢালিয়া সাজিতে হইবে, যাহাতে এ দেশের ছেলেমেয়েরা কল্পনা, ধারণাদি সুকুমার বৃত্তিগুলির কৌতূহল-তর্পণের সঙ্গে বস্তুনিষ্ঠাও লাভ করে, স্বপ্নের চেয়ে সত্যের মহিমা কম আশ্চর্য্যকর নহে, তাহা উপলব্ধি করিতে শিখে। ভূগোল, ইতিহাস, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতির উপর ভিত্তি করিয়া এমন স্বাস্থ্যকর শিশু-সাহিত্যের নিদর্শন সকল আধুনিক সভ্য স্বাধীন জাতির মধ্যেই পাই। বাংলায়ও সেই প্রয়োজন অনিবার্য্য প্রয়োজন-সূত্রে বহিয়া আসিতেছে।

আমরা এই শ্রেণীর শিশু-সাহিত্যের পরিপুষ্টি কল্পে এক স্তবক গ্রন্থমালা প্রকাশ করিব, মনঃস্থ করিয়াছি। নিরেট বস্তুতন্ত্র বৈজ্ঞানিক খাদ্য সরস মধুর করিয়া পরিবেশন করার ইচ্ছা আমাদের—গ্রন্থকারেরও। চারুবাবুর "**নানা কথা**" বৈজ্ঞানিক ভূমিকা-প্রস্তুতির যথার্থ সহায়তা করিবে—এই বিশ্বাসেই এই প্রকাশ-কার্য্যে অগ্রসর হইলাম। সাফল্যের পরিমাণ সুধীবৃন্দের বিবেচ্য।
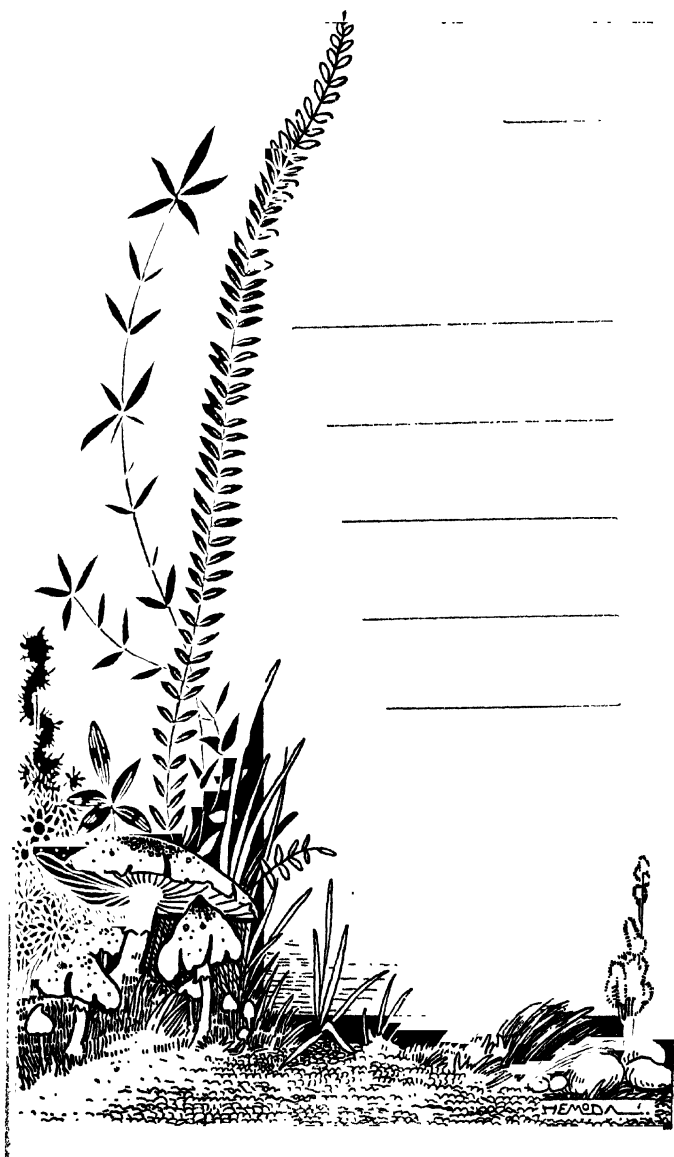
—ইতি

সূচিপত্র

আদিম মানুষ ও তার শত্রু

সেকাল

এই কলকাতা সম্বন্ধে এক কালে আমাদেরই দেশের লোক গান বেঁধেছিল, আজব শহর বানিয়েছে দেখ ইংরেজ কোম্পানী। কিন্তু আজ আর তোমাদের চোখে এ শহর আজব লাগে কি? এই বিজলীর আলো, মোটর গাড়ী, বড় বড় চৌতলা বাড়ী, মনে হয় যেন চিরদিনই আছে। অথচ, বেশী দিনের কথা নয়, তিন চার পুরুষ আগেই, সাহেবেরা বন্দুক নিয়ে গড়ের মাঠের জঙ্গলে শিকার খেলত। সাধারণ লোকে শ্যামবাজার কালীঘাট অঞ্চলে হোগলার কুঁড়েতে বাস করত, সন্ধ্যা হতে না হতে চোর-ডাকাতের ভয়ে বাঘ-ভাল্লুকের ভয়ে দোরে আগড় দিত। কালে কালে কি না হয়! বাদশাহী আমলে এই কলকাতার বেশীর ভাগই ছিল ধাপার মতন জলা। গঙ্গার সঙ্গে সেই জলার যোগ ছিল খাল দিয়ে। গোলতলাওয়ের কাছে ক্রীক রো (খালের রাস্তা), ডিঙ্গা-ভাঙ্গা লেন, এই সব গলির নাম থেকে বোঝা যায় যে ঐখান দিয়ে একটা খালের মতন বইত, তাতে নৌকা চলাচল ছিল।

নানা কথা

আরও পুরানো কথা বলি শোন। এই পৃথিবীর সৃষ্টি যে কি করে হয়েছিল, সে সম্বন্ধে নানা আন্দাজী কথা শোনা যায়। আমাদের হিন্দুশাস্ত্রেই কত রকম বর্ণনা আছে। সে বিষয়ে আমি কিছু বলব না। তবে মোটামুটি ধরে নাও যে একদিন এই সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র, আলো, অন্ধকার, কিছুই ছিল না। ধীরে ধীরে ভগবানের কৃপায় এরা এসে উপস্থিত হয়েছে। এই জন্যই হিন্দুরা ভগবানকে সৃষ্টিকর্ত্তা, বিশ্বকর্ম্মা, এই সব নাম দিয়েছে, আর মুসলমানেরা তাঁকে রজাক বা রাজিক বলে ডাকতে ভালবাসে। ভগবান যে কেন সৃষ্টির কল্পনা করেছিলেন, তা জানা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

তার পর, এই পৃথিবীতে যে সমস্ত জন্তু জানোয়ার আজ দেখছ, তারাও কিছু চিরদিন ছিল না। নানা জায়গায় মাটি-চাপা বরফ-চাপা যে সমস্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জন্তুর পঞ্জর বা হাড় পাওয়া গেছে, তারা অনেক দিন লোপ পেয়েছে! বিশ হাত, তিরিশ হাত লম্বা সে সব জন্তু আজ দেখতে পেলে তোমরা কি করতে, কে জানে! রাক্ষুসে জানোয়ারদের মধ্যে বেঁচে আছে জলে এক তিমি মাছ, আর ডাঙ্গায় এক হাতী। শুধু জন্তুর কথা কেন, পৃথিবীর নিজের চেহারাই কত বদলে গেছে! আজ যেখানে ডাঙ্গা, সেখানে হয় ত আগে ছিল সমুদ্র। আজ যেখানে অপার অগাধ সমুদ্র, সেখানে এক-কালে হয় ত ছিল বিশাল মহাদেশ। এ সব বিষয়ে যাঁরা খোঁজ খবর রাখেন, তাঁরা বলেন যে হিমালয়ের মতন উঁচু পাহাড়ের উপরে পর্য্যন্ত নানা জলজন্তুর হাড় পাওয়া গেছে। আবার ডুবুরীরা কত ফটো তুলে এনেছে, যার থেকে

ভূমিকম্পের ফাটল

এক সঙ্গে অতগুলো গ্রহের টানে পৃথিবীর ভেতরের জলরাশি টলমল করে উঠেছিল। গ্রহ নক্ষত্র আর তাদের আকর্ষণের কথা তোমাদিকে পরে বলব। কিন্তু তারা যে টানে এটা নিশ্চিত।

যাক্, ভূমিকম্পের ঠিক কারণ যাই হোক, এটা তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছ যে পৃথিবীর উপরটা তার গর্ভের আগুনের তেজে কত রকমে বদলে যেতে পারে। আজ যখন বেহারের মতন ভীষণ ব্যাপার হতে পারে, তখন সাবেক কালে কি সব কাণ্ড হয়েছে, কত বার হয়েছে, কে বলতে পারে!

তার পর দেখ, ঝড় বৃষ্টির দরুণ প্রতি বৎসর কত কি ব্যাপার চলেছে! নদীর এক পাড় ভাঙ্গা আর অন্য পাড়ে চড়া পড়া, এ ত তোমরা রোজই চোখে দেখতে পাচ্ছ। এই রকম ভেঙ্গে ভেঙ্গে আমাদের এই বাঙ্গলা দেশের নোয়াখালী শহর আজ নদীগর্ভে যেতে বসেছে। তা ছাড়া, বর্ষার দিনে গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের মতন বড় বড় নদী, পাহাড় থেকে লক্ষ লক্ষ মণ বালি, কাঁকর বয়ে এনে পলি-মাটি তৈরী করে বাঙ্গালার জেলায় জেলায় ঢেলে দিচ্ছে। দশ হাজার বছরে এর ফল কি হবে বলতে পার?

এই যে আমরা মানুষ, আমরাই কি চিরদিন এখনকার মতন ছিলাম? যেমন অন্য সব জিনিসের রূপ বদলে বদলে এখন এক রকম দাঁড়িয়েছে, মানুষেরও ত তাই! আমাদের রূপ যুগে যুগে কি রকম বদলে বদলে এসেছে, কি রকম করে আমাদের দেহ একটা বেঢপ ক্ষুদ্র জড়পিণ্ড অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে এখনকার সুন্দর সুঠাম মূর্ত্তি পেয়েছে, কি করে আমাদের মাথা আজ পাঁচ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অসাধ্য সাধন করছে, এ সব কথা

বোঝা তোমাদের পক্ষে কঠিন হবে। যদি এই ছোট্ট বইখানি পড়ে বুঝতে পার, ত আমি মানবের জন্মকথার বিষয়ে পরে একখানা আলাদা বই লিখব। শুধু এইটুকু এখন ভেবে দেখতে বলি। মানুষের দেহটা বড় সুকুমার, তার চামড়া নরম, গায়ে রোঁয়া নেই, পায়ে খুর নেই, এ দেহ নিয়ে খুব বেশী কষ্ট সহ্য করা সম্ভব নয়। কাজেই, যখন পৃথিবী ঢের বেশী ঠাণ্ডা ছিল, কি বেজায় গরম ছিল, কি সব জলময় ছিল, তখন এই চোদ্দ পোয়া নরম শরীরখানা নিয়ে কোন জীবই বেঁচে থাকতে পারত না। এটা তাহলে ধরে নিতে পার, যে যখন মানুষের জন্ম হয়েছে তখন দুনিয়া থেকে সেই সেকেলে রাক্ষসগুলো চলে গেছে, আর দুনিয়ার আব-হাওয়া সহ্য করবার মতন হয়েছে।

যারা হিন্দু তাদের এটাও ভেবে দেখতে বলি, যে পুরাণের মতে ভগবান চিরদিন মানুষের দেহ নিয়ে পৃথিবীতে আসেন নেই। যখন পৃথিবীর যে রকম অবস্থা, সেই বুঝে তিনি দেহধারণ করেছিলেন। জলের যুগে মাছ, পাঁকের যুগে কচ্ছপ, ভিজে মাটির যুগে বরাহ, বনজঙ্গলের যুগে সিংহ। এমন কি, যখন প্রথম নরদেহ নিয়ে এলেন, তখন সেই কালের আদিম মানুষের মতই বামনরূপে অবতীর্ণ হলেন।

বামনের পরের অবতারের নাম মনে আছে ত, পরশুরাম! পরশুধারী মানবের দেবতা—যে মানবকে সেকালের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জঙ্গল কেটে নিজেদের বাসভূমি তৈরী করতে হয়েছিল! এ সব পুরাণের কথা। তোমাদের ইচ্ছা না হলে মানতে নাও পার, আমার কোন দুঃখ নেই তাতে। তবে এই অবতারের

সেকাল

গল্প থেকে বেশ একটা ছবি পাওয়া যায়, পৃথিবীর যুগে যুগে কি রকম চেহারা বদলে আসছে।

আমার গল্প এইখান থেকে আরম্ভ করি। চারিদিকে গভীর জঙ্গল। সেইখানে বুনো জানোয়ারের মাঝে মানুষের বাস। ঘর-বাড়ী নেই, ক্ষেত-খামার নেই, পথ ঘাট নেই। মানুষ পেটের ধান্দায় বন-বাদাড়ে ঘোরে, ফলটা পাকুড়টা পেড়ে খায়, নয় ত ছোট খাটো জন্তু ধরে খায়। হয় ত বা চুপি চুপি পাখীর বাসা থেকে তার ছানা, কি তার ডিম, চুরী করে আনে। সূর্য্য ডুবলেই গর্ত্তে, কি কোটরে, কি গাছের ডালে, লুকিয়ে বসে। কেন না, তার হাজার দুশমন। তখন দুনিয়ার নিয়মই ছিল এই, যে যাকে পারে ধরে খায়। জানোয়ারে জানোয়ারে ক্রমাগত যুদ্ধ চলেছে পেটের জন্যে।

এ দিন কিন্তু রইল না। মানুষের মাথার খুলীটা আস্তে আস্তে বড় হতে লাগল, আর তার ভেতরের মগজটা বাড়তে লাগল। খুলীর ভেতর তার একটা বুদ্ধি বলে জিনিস ক্রমে ক্রমে গজিয়ে উঠল। এত প্রাণী থাকতে মানুষের মাথাতেই কেন বুদ্ধি গজাল, তা এই দুনিয়ার মালিক ছাড়া আর কেউ জানে না। আর এক ব্যাপার ঘটল। মানুষ পেছনের দু পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠতে শিখলে। একবার দাঁড়িয়ে উঠল, ত টলে টলে চলতে আরম্ভ করবেই। ছোট ছেলেদের দেখেছ ত, কেমন আস্তে আস্তে চলতে শেখে! টলে টলে, হাঁটি হাঁটি পা পা করে, চলা থেকে সোজা হয়ে চলতে বেশী দেরী হয় না। সহজেই অভ্যাস হয়ে যায়। মানুষ যখন পেছনের পায়ের উপর

অনায়াসে চলা-ফেরা শিখলে, তখন সে তার সামনের পা দুটোকে অন্য পাঁচ রকম কাজে লাগাতে আরম্ভ করলে। ক্রমে সে দুটো পায়ের একটা আলাদা নাম হল, হাত। আগে ছিল চার পায়ের আঙ্গুলেরই সমান মাপ। এখন হাতের আঙ্গুল গুলো নানা কাজ করতে বেশ লম্বা হয়ে উঠল। কাজের আরও সুবিধা হল।

আঙ্গুলের গড়ন যে বদলে যায় তা তোমরা নিশ্চয় দেখেছ। তোমাদের পায়ের আঙ্গুল দেখ কি সুন্দর স্বাভাবিক। আর সাহেবদের দেখ, চোদ্দ পুরুষ জুতো পরে পরে, সেই আঙ্গুল কি রকম ঠুঁটো, কদর্য্য, অস্বাভাবিক হয়ে গেছে। যদি জুতো পরে, গাড়ী চড়ে, ঘুরে বেড়ান আরও দু পাঁচশো বছর চলে, ত মানুষের পায়ে আর আঙ্গুল থাকবে না।

সে কথা যাক্। দাঁড়াতে শিখে মানুষের কি মজা হল, ভেবে দেখ! বনের জন্তুর মধ্যে সে তুলনায় দুর্ব্বল ছিল। তার দেহ নরম, জোর কম। একটা বড় গোছের বন-বিড়াল দেখলে সে পালাত। কিন্তু সেই মানুষ যেই একবার দু পায়ে চলতে দৌড়তে শিখলে, কি সব বদলে গেল। সে এক ভীষণ শক্র হয়ে দাঁড়াল। কেন না, সে এখন দু হাতে প্রকাণ্ড গাছের ডাল কি মস্ত পাথরের চাঙ্গড়া নিয়ে, বাঘ ভালুকের মাথা ফাটিয়ে দিতে পারে।

একবার যখন হাতের কাজ সুরু হল, তখন থামবে কেন! কাঠ, পাথর ঘসে ঠুকে, নানা রকমের হাতিয়ার তৈরী হতে লাগল। বাসের জন্য ঘর বাঁধা আরম্ভ হল। জলে শিকারের সুবিধার জন্য ভেলা ডিঙ্গী ভাসান হল। মানুষ কোমর বেঁধে লেগে গেল দুনিয়া জয় করবে বলে। মাথায় আক্কেল ত ভগবান

দিয়েই ছিলেন। কাজ করতে করতে সে আক্কেল বেড়ে চলল। নিজের আরামের জন্য, দুশমন মারবার জন্য, রোজ নূতন নূতন হিকমৎ মাথা থেকে বার হতে লাগল।

অস্ত্র তৈরী করতে করতে মানুষ বুঝতে পেরেছিল যে কাঠ পাথর ঘসে আগুন জ্বালা যায়। সে আগে শিকারের মাংস পচিয়ে নরম করে খেত। (সিংহ আজও তাই করে।) কিন্তু আগুন জ্বালতে যখন শিখলে, তখন দেখলে যে মাংস পচাবার দরকার নেই, ঝল্‌সে নিলেই বেশ নরম হয়। রান্না-বিদ্যার পত্তন হল।

পাথরের ভাল মজবুত কুড়াল যেই তৈরী হল, মানুষ গাছ কাটতে লেগে গেল। গাছের গুঁড়ীর মাঝখানটা পুড়িয়ে কুরে ফেলে দিয়ে প্রথম নৌকা তৈরী হল। কাটা গাছের গুঁড়ী ভুঁইয়ে গড়িয়ে নিয়ে যেতে যেতে বুঝতে পারলে যে ভারী জিনিস ঘস্‌টে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে গড়িয়ে নিয়ে যাওয়া সোজা। গাড়ী তৈরী করার ফিকির প্রথম মাথায় ঢুকল।

এই রকম কত বিদ্যাই যে মানুষ রপ্ত করতে লাগল, তার ঠিকানা নেই। কিন্তু সেই সাবেক কালের সব চেয়ে বড় বিদ্যা চাষ। বনের ধারে, জলের কিনারায় যে জঙ্গলী ধান, গম, যব, জন্মাত তা এরা ছাগল হরিণের দেখাদেখি আগেই খেতে শিখেছিল। কোন দিন, ঘটনা ক্রমে কি বুদ্ধির জোরে, কেউ জানতে পারলে যে এই সব ঘাসের বীজ মাটিতে ছড়িয়ে দিলে গাছ হয়। একবার যখন এই সহজ উপায়ে খাদ্য জোগাড় করতে শিখলে, তখন আর রোজ রোজ কষ্ট করে বনে পাহাড়ে

শিকার করতে যাবে কেন? খানিকটা খানিকটা জায়গা সাফ করে নিয়ে সেইখানে চাষ-বাস লাগিয়ে দিলে।

আমাদের ত্রেতা যুগের পূর্ব্ব পুরুষেরা যে চাষকে কত মহৎ কাজ মনে করতেন, তা পুরাণের গল্প থেকেই বোঝা যায়। অহল্যা উদ্ধারের গল্প জান ত? অহল্যা শব্দটার মানে, যে জমিতে হল চালান যায় না। অর্থাৎ যেখানে ধান হয় না। রামচন্দ্র সেই পাষাণীর উদ্ধার করলেন, এর মোদ্দা কথাটা ত রামচন্দ্র পাথরে কাঁকরে ভরা জমিতে চাষ লাগিয়ে দিলেন! তারপর দেখ, রামচন্দ্র বিবাহ করলেন কাকে! সীতা দেবী ত মানবীর পেটে জন্মান মেয়ে ছিলেন না। তাঁর বাপ জনক মহারাজ চাষ করছিলেন, সেই সময় মেয়েটী লাঙ্গলের ফালে উঠেছিল। চোদ্দ বছর এই লাঙ্গলের মেয়েটীকে নিয়ে রাম লক্ষ্মণ বানর-ভূমি রাক্ষস-ভূমিতে ঘুরলেন। এই বানর ও রাক্ষসরা চাষবাস জানতও না, করতও না। সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব, তারপর লঙ্কা বিজয়, এর থেকে আমি ত এই বুঝি যে, এই দুই আর্য্য রাজকুমার দক্ষিণের বুনো জাতদিকে সে যুগের শ্রেষ্ঠ বিদ্যা চাষ শিখিয়ে এলেন।

আর এক রাম অবতারের কথা মনে আছে ত, হলধর বলরাম? তিনি ত সর্ব্বদা লাঙ্গল কাঁধে করেই ঘুরে বেড়াতেন। মানুষ যখন কৃষির কদর বুঝতে পেরেছিল, সেই যুগে ইনি কৃষাণের অবতার ছিলেন।

চাষের কাজ যখন সুরু হল, তখন অবস্থা এই যে, চারিদিকে শত্রুতে ভরা জঙ্গল তার মাঝখানে চাষের জমী। নিজেদের

বাঁচাতে হবে ত! তাই কয়েক ঘর কৃষাণ মিলে এক জায়গায় বসবাস করতে আরম্ভ করলে। যখন ঘর তৈরী করার বিদ্যা আয়ত্ত হল, তখন ঘরও বাঁধলে। গ্রাম শহরের গোড়া পত্তন হল। এক সঙ্গে থাকতে থাকতে মানুষ সমাজ গড়তে লেগে গেল। গ্রাম ও গ্রাম্য-সমাজ থেকে ধীরে ধীরে রাজ্য গড়ে উঠতে আরম্ভ হল। একটা রাজা প্রজার সম্বন্ধ স্থির হল।

মানুষ যখন বনে থাকত, তখন একজন আর একজনের সুখ-দুঃখের কোন হিসেব রাখত না। কিন্তু যখন মিলে মিশে গাঁয়ে বাস করতে এল, তখন সারা গাঁটার কাজ-কর্ম্মের ব্যবস্থা করতে হল ত! ব্যবস্থা করার ভার ছিল তাদের দলপতি অর্থাৎ রাজার উপর। দেখ, কাজ কত রকমের ছিল! একটা কাজ হল, বুনো মানুষ ও জানোয়ারের হাত থেকে গ্রাম ও ক্ষেত বাঁচান একদল লোক কুস্তী কসরৎ করে হাতিয়ার চালান অভ্যাস করে, দেশের রক্ষক বলে মোতায়েন হল। তারপর ধর, খাওয়া পরার বন্দোবস্ত, ঘর-দোর পথ-ঘাট তৈরী, এও ত দেখা চাই। আর একদল লোক এই কাজ নিয়ে রইল। কিন্তু সব চেয়ে বড় কাজ হল বুদ্ধির চর্চ্চা, যে বুদ্ধির বলে মানুষ বাঘ-সিংহের মতন ভীষণ জানোয়ারকেও কাবু করেছিল, বনের কুকুর, গরু, ঘোড়াকে পুষে নিজের কাজে লাগিয়েছিল। সে বুদ্ধিকে তো ভোঁতা হতে দেওয়া যায় না! একদল লোককে রাজা লাগালেন বিদ্যা-চর্চ্চা করতে। তারপর ধর্ম্ম-কর্ম্ম জিনিসটা মানুষের মাথায় এল, তার ভারও পড়ল এই বিদ্যা-ব্যবসায়ীদের উপর। এই রকম করে মানব-সমাজে তিন শ্রেণী হল—পণ্ডিত,

সিপাহী ও কৃষাণ। রাজা প্রথম প্রথম সকল শ্রেণীর কাজই করতেন। কিন্তু যুদ্ধের কাজ যত বেড়ে যেতে লাগল, রাজা ততই ফৌজ-পল্টন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্ম পণ্ডিতদের একচেটে হয়ে গেল। তাঁরাই দেশের মাথা হয়ে দাঁড়ালেন। রাজাও আর তাঁদের কথার উপর কথা কইতে সাহস পেতেন না। এতে রাজ্যের, সমাজের, কাজ বেশ সুশৃঙ্খলায় চলতে লাগল। কেন না, প্রত্যেক শ্রেণীর কর্ম্মীর চোদ্দ পুরুষ ধরে একই রকমের কাজ করে করে হাত ও চোখ দিব্যি পেকে গেছে। কিন্তু নূতন হিকমৎ বার করার ক্ষমতা আর তাদের নেই। সে শক্তি কেবল পণ্ডিতদেরই আছে। অস্ত্র বিদ্যাই বল, বাড়ী তৈরী করাই বল, নগর পত্তনই বল, চিকিৎসাই বল, সব বিষয়ে তাঁরাই গুরু হয়ে বসলেন। তাঁরাই নূতন নূতন বিদ্যা বার করছেন, তাঁরাই কেতাব লিখছেন, তাঁরাই পড়ছেন। সিপাহী, কারিগর, কৃষাণ, ক্রমশঃ এদের সঙ্গে পড়া-শুনোর কোন সম্পর্কই রইল না। আর শূদ্র যারা, তাদের তো পড়াশুনো করার উপায়ই ছিল না। করলে ভয়ানক শাস্তি হত। অনেক শো বছর এইভাবে মানুষের কাটল।

এখনকার দিনে বই পড়া জিনিসটা আমাদের অনেকের কাছে নিত্যকর্ম্ম, ভাত খাওয়ার মতন। কিন্তু চিরদিন ত আর তা ছিল না! কি করে এই কেতাব পদার্থটা দুনিয়াতে এল, সেটা তোমাদিকে বলি। বেশ মজার কথা!

মানুষ যখন নিতান্ত বুনো ছিল, তখন তারা কথা কইতে জানত না। অন্য জানোয়ারের মতন, ভয় পেলে কি খিদে পেলে

জ্বালামুখী বা আগ্নেয় গিরি।

বোঝা যায় যে সমুদ্রের পেটের ভেতর কত পাহাড় পর্ব্বত, এমন কি বন জঙ্গল, ডুবে আছে। কেন যে এমন জলে ডাঙায় যুদ্ধ চলে, তার ঠিক কারণ তোমাদের বোঝান শক্ত। তবে এই পৃথিবীর গর্ভে আগুন আছে জান ত? কোন কোন জায়গায় পাহাড়ের চূড়ায় গর্ত্ত আছে। গভীর গর্ত্ত, কত গভীর তা কেউ জানে না। তার ভেতর থেকে মাঝে মাঝে আগুন, ফুটন্ত জল, গলা ধাতু ভীষণ বেগে বার হয়। বেরিয়ে চারিদিকের কত কত ক্রোশ জমী ছাই করে দেয়। এই অগ্নিকাণ্ডের আগে অনেকক্ষণ কি রকম গুড়-গুড় গুড়-গুড় আওয়াজ হয়, আর একটু একটু ধোঁয়া বেরোয়। তা ছাড়া মানুষ আর কিছু জানতে পারে না আগে থেকে। এই রকম পাহাড়ের নাম জ্বালামুখী। পৃথিবীতে সর্ব্বত্র আছে।

তার পর, নানা তীর্থস্থানে গরম জলের কুণ্ড আছে। এদের কথা তোমরা শুনে থাকবে। আমাদের এ অঞ্চলে বিখ্যাত মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডু। এই যে গরম জল বেরোয়, এ আসে পৃথিবী-গর্ভের আগুনের কাছ থেকে। কোথাও জল বেশ পরিষ্কার, কোথাও বা গন্ধকের গন্ধ।

এই যে ভূগর্ভের আগুন, এর দরুণ আবার মাঝে মাঝে ভূমিকম্প হয়। কখন বেশী, কখন কম। বেশী জোরে কম্প হলে মাটি ফেটে ফুটন্ত কাদা-জল, বালি, গন্ধকের ধোঁয়া, এই সব ফোয়ারা দিয়ে বেরোয়। এই যে ভুঁইয়ে ফাটল হয়, এ কত গভীর কেউ জানে না। বড় বড় বাঁশ ঢুকিয়ে দেখা গেছে, চক্ষের নিমেষে তলিয়ে যায়। কয়েক বছর আগে উত্তর বাঙ্গলার অনেক

জেলায় ভীষণ ভূমিকম্প হয়েছিল। সম্প্রতি উত্তর বেহারে যে প্রলয় কাণ্ড হয়ে গেল, তার কথা তোমরা নিশ্চয় শুনেছ। এ রকম সর্ব্বনাশ অনেক দিন পৃথিবীতে হয় নেই। কত শহর একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে। অন্ততঃ বিশহাজার মানুষ মারা গেছে, গরু বাছুরের ত কথাই নেই। বালি পড়ে হাজার হাজার বিঘে জমী প্রতি জেলায় এমন নষ্ট হয়ে গেছে, যে অনেক বছর সেখানে চাষ হবে না। শুধু মাটি ফেটেছে তা নয়, ভুঁইয়ে যেখানে সেখানে ছেঁদা হয়েছে। তার কাছে যেতে লোকে ভয় পায়, পাছে আবার হঠাৎ গরম জলের ফোয়ারা উঠে। কোথাও জমী নেমে গেছে, কোথাও উঠে পড়েছে। নদী অনেক মজে গেছে। বর্ষা এলে বোঝা যাবে যে জল নিকাশের স্বাভাবিক ব্যবস্থা কতটা উলট-পালট হয়েছে।

অনেক বিদ্বান লোক বেহারের এই কম্পের কারণ স্থির করতে বসেছেন। তবে পৃথিবীর পেটের ভেতরে ঠিক কি হয়েছিল, তা বলা কঠিন। হতে পারে নূতন জ্বালামুখী পাহাড় উঠার উদ্যোগ করছে। হতে পারে, হিমালয় পর্ব্বতের ওজন কমে যাওয়াতে নীচে চাপের যে গোলমাল হয়েছিল, সেইটে কেঁপে ঠিক হয়ে গেল। হিমালয় পর্ব্বতের ওজন কমার কথা শুনে অবিশ্বাসের হাসি হেসো না। ঝড়ে, জলে, বৃষ্টিতে সকল পাহাড়ই ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যায়, এতে অবিশ্বাস করার ত কিছু নেই!

তার পর হিন্দু জ্যোতিষীরা যে কথা বলছেন সেটাও তোমাদের জানা উচিত। পয়লা মাঘ হতে দু তিন দিন অনেক গুলো গ্রহ আকাশের মকর রাশি বলে এক ভাগে জমা হয়েছিল।

এক রকম কাঁদত, আর যুদ্ধ করবার সময় এক রকম গর্জ্জন করত। কিন্তু বুদ্ধি গজাবার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ করে একত্র বাস আরম্ভ হওয়ার পরে, আরও নানা রকম শব্দ তাদের মুখ থেকে বেরোতে লাগল। আস্তে আস্তে এই শব্দগুলোর মানে ঠিক হল। ছোট ছেলেরা যে ভাবে কথা কইতে শেখে, সেই রকম কসরৎ অনেক শো বছর ধরে করে করে মানুষ মানুষের কাছে মুখের আওয়াজের দ্বারা মনের ভাব জানাতে শিখলে।

আবার কত শত বছর কেটে গেল। তখন আর একটা আশ্চর্য্য বিদ্যা মানুষের আরম্ভ হল। লেখার সৃষ্টি হল। একদিনে হঠাৎ এ বিদ্যা এসে উপস্থিত হলো, তা মনে কেরো না। ছুনিয়ার সকল জাত, কি সকল মানুষ আজও লেখাপড়া শেখে নাই। কিন্তু অনেক হাজার বছর আগে এ বুদ্ধি মানুষের মাথায় প্রথমে এসেছিল। বিলেত আর আমাদের দেশ, এর মধ্যপথে মিসর বলে এক অতি পুরাতন দেশ আছে। অনেকের মতে সেই দেশের লোকেরাই প্রথম লেখার পত্তন করেন। কেউ কেউ আবার বলেন যে আমাদের এই ভারতবর্ষেই এ বিদ্যার প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল। কোথায় আরম্ভ হয়েছিল তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু একেবারে কিছু অক্ষর সৃষ্টি হয় নেই। প্রথমে লেখাগুলো ছিল ছবি মাত্র। হাত বলতে হাতের ছবি আঁকত, নাক বলতে নাকের ছবি, দাঁত বলতে দাঁতের ছবি, কান বলতে কানের ছবি এই রকম। তার পর হল কি, নাকের ছবিটার নাম হল ন, অর্থাৎ নাক শব্দের প্রথম

অক্ষর। তেমনি দাঁত, হাত, কান, সাপ এই সব ছবির নাম হল দ হ ক স। গমন মানে ত চলা। তাই চলবার সময় দুটো পা যে রকম থাকে, অর্থাৎ একটা সোজা, একটা তোলা, সেই রকম এঁকে তার নাম দেওয়া হল, প্রথমে গমন, তার পর গমনের প্রথম অক্ষর গ।

যারা আরবী হরফ চেনে, তাদের জন্য তার একটা উদাহরণ দিই। আরব দেশ মরুভূমি। সেখানকার লোক যাওয়া আসা করে উটে চেপে। উট জন্তুটা সকলের পরিচিত। উটের পুরানো আরবী নাম গামেল। কাজেই সেখানে গ অক্ষরটার ছবি হল উটের মূর্তি।

চীনের ভাষায় আজও আমাদের মত আলাদা আলাদা অক্ষর নেই। প্রত্যেক কথার একটা করে ছবি আছে। যেমন মানুষ লেখা হয় মানুষের ছবি এঁকে, স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকের ছবি এঁকে, বালক ছোট্ট মানুষের ছবি এঁকে। চীনে ভাষা শিখতে গেলে এই রকম গাদা খানেক বাঁধা ছবি আছে, তাই শিখতে হয়। নূতন কথা তৈরী হয়, এই ছবিগুলো জুড়ে জুড়ে। কি রকম তোমাদিগকে বলি। ধর, বাড়ী কথাটা লিখতে হবে, অথচ এর কোন বাঁধা-ধরা ছবি নেই। তখন করবে কি, একটা লম্বা মাত্রা টেনে দিয়ে তার নীচে এঁকে দিলে একজন পুরুষ, একটী স্ত্রীলোক আর একটী ছেলে। মাত্রাটা যেন হল ঘরের ছাদ। এক ছাদের তলায় বাপ-মা, ছেলে থাকলেই ত বাড়ী!

তার পর ধর, লিখতে হবে গল্প-গুজব। লম্বা মাত্রা টেনে তার নীচে এঁকে দিলে দুজন স্ত্রীলোক। এক ছাদের তলায়

দুটী স্ত্রীলোক জমা হলে গল্পগুজব করে বই কি! চীনেও করে, সব দেশেই করে!

সকল ভাষাই এই রকম করে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। তোমাদের কতকটা ধারণা হল ত!

আচ্ছা, তাহলে একত্র বাস করতে করতে মানুষ প্রথম কথা কইতে শিখলে। তার পর, অনেক হাজার বছর পরে লিখতে শিখলে। এই রকম করে আবার এক যুগ কেটে গেল। এই যুগে কত কেতাবই লেখা হল, তার ঠিক নেই! নানা বিদ্যার চর্চ্চা আরম্ভ হল। কিন্তু, আগেই তোমাদিগকে বলেছি যে এই বিদ্যাচর্চ্চা শুধু এক দল লোকের হাতেই রইল। হাতে লেখা পুঁথী-পত্র তাঁদের ঘরেই থাকত। সাধারণ লোকে তার কি সন্ধান পাবে!

এমন সময় আর এক ব্যাপার ঘটল। মানুষের জীবনে সে এক মস্ত দিন। ছাপার কলের সৃষ্টি হল। যে বন্ধ সিন্দুকে বিদ্যার পুঁজী তোলা ছিল, তার ডালা গেল খুলে। অদ্ভুত কাণ্ড হল! যে অক্ষর চিনবে, সেই বই পড়তে পাবে। আর আটকায় কে! বই পড়লেই বিদ্যার সন্ধান পাবে, যে বিদ্যা মানুষকে জগতের শ্রেষ্ঠ জীব করেছে! ছুটল মানুষ, বড় ছোট, ধনী নির্ধন, ছাপা বই সংগ্রহ করতে। ধীরে ধীরে বিদ্যার আলো আমাদের এই আঁধার দেশময়ও ছড়িয়ে পড়েছে। তোমরা সবাই বেরিয়ে এস, সেই আলোয় স্নান করে ধন্য হও। স্ত্রীপুরুষ, ছেলেবুড়ো, কেউ ঘরের কোণে বসে থেকো না।

এ সংসার নিয়মের রাজ্য। এখানে কোন ঘটনাটাই এলোমেলো-ভাবে ঘটে না। যিনি এই দুনিয়ার মালিক, তিনি

যে নিয়ম-কানুন বেঁধে দিয়েছেন, সেই বাঁধা নিয়মে সব কিছু হচ্ছে। শুধু সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারার কথা বলছি না। সামান্য যে পাতাটী পর্য্যন্ত গাছ থেকে পড়ছে, তারও পেছনে একটা গভীর কারণ আছে! এই কারণ, এই নিয়ম, জানবার জন্য মানুষের মন অনাদি কাল থেকে হাঁপাচ্ছে। সবই যে জেনেছে, তা নয়। সব যে কখন জানবে, তারও হয় ত আশা নেই। তবু যেটুকু ধরা পড়েছে, সেটুকু সকলেরই জানা কর্ত্তব্য। জানবার উপায়ও সোজা। সকল বিষয়েই এখন বই বার হচ্ছে। পড়লেই সব জানতে পারবে। তোমাদিগকে সেই পথে এগিয়ে দেওয়াই আমার কাজ।

আর এখন সে দিন নেই যে, মানুষ না বুঝে কারও কথা মেনে নেবে। খুব ভালই হয়েছে! তবে কি জান, মানার পালা সাঙ্গ হলে, বোঝার পালা তখনই জুড়ে দেওয়া চাই। নইলে সংসার অচল হবে।

এই সামান্য বইটীতে তোমাদিগকে আর আমি কতটুকু বোঝাতে পারব! তবে মোটামুটি এইটে তোমাদের ধারণা করে দিতে চাই, যে বিশ্বসংসার দিন দিন উন্নতির পথে চলেছে। পৃথিবীর জল-হাওয়া মাফিকসই হয়েছে। রাক্ষসের মতন প্রকাণ্ড ভীষণ জানোয়ারগুলো গেছে। সর্ব্বত্র চাষ-বাস হচ্ছে। মানুষের মতন একটা বুদ্ধিমান প্রাণী পৃথিবীর রাজা হয়েছে। সে বড় বড় বাড়ী, শহর, রাস্তা-ঘাট তৈরী করতে শিখেছে, মস্ত মস্ত সমাজ ও রাজ্য গড়ে তুলেছে। রেল, জাহাজ, উড়ো-জাহাজ, টেলিগ্রাফের সৃষ্টি হয়ে সারা দুনিয়াটা যেন হাতের কাছে এসেছে। সব চেয়ে বড় কথা এই, যে কেউ আর সাহস করে বুক ফুলিয়ে বলতে পারে

না, "হ্যাঁ, আমি তোমার খাবার কেড়ে খাব। বেশ করব। জোর যার, মুলুক তার।"

কেড়ে কেউ খায় না, তা আমি বলছি না। এখনও অনেকে খায়। কিন্তু সে চুরী করে খায়, লুকিয়ে লুকিয়ে খায়, মিথ্যা কথা বলে খায়।

আশা আছে, যে ভবিষ্যতে সকল দেশের মধ্যে একটা ভাই-ভাই ভাব আসবে, যুদ্ধ-বিগ্রহ থেমে যাবে। সে দিন এখনও বহু দূরে। কিন্তু তার গোড়া পত্তন হয়েছে। তোমরা যদি মনে কর ত দুদিনে যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ করতে পারবে। তোমাদের সাহায্য না পেলে রাজা-উজীর বড় লোকে আর যুদ্ধ কদিন চালাবে! তোমরা একবার জেগে উঠলে তোমাদিকে রুখবে কে! ইচ্ছা করলেই তোমরা এমন ভাবে রাজ্য চালাতে পারবে যে গরীবের কোন দুঃখ থাকবে না। সারা দেশময় তাদের জন্য বড় বড় ইস্কুল-কলেজ, হাঁসপাতাল, ভাল থাকবার বাড়ী, প্রচুর খাবার, এ সবেরই বন্দোবস্ত করতে পারবে। দেশ সকলেরই দেশ, কারও একার সম্পত্তি নয় ত! আমি উড়ো কথা বলছি না। মার্কিন, রুষিয়া, বিলেত ইত্যাদি দেশে প্রজারা একতার বলে, বিদ্যা বুদ্ধির বলে, নিজেদের হক্ সাব্যস্ত করে নিয়েছে, নিজেদের মঙ্গলের জন্য হাজার রকমের ব্যবস্থা করছে। উন্নতির পথে যে সব কণ্টক ছিল, একে একে সরে যাচ্ছে। পৃথিবীতে এ দিন এসেছে। সবাই যা করছে, তোমরাই বা না পারবে কেন? তবে এ ত মারামারি কাটাকাটির কথা নয়। বিদ্যার কথা, বুদ্ধির কথা, একতার কথা।

নানা কথা

আগে বোঝা চাই যে তোমাদের কিসের অভাব, কি করলে সে অভাব দূর হবে। তবে ত নিজের ভার নিজেরা নিতে পারবে! কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, যে মানুষে মানুষে ভেদ, মানুষে মানুষে শত্রুতা, যা আছে সেটা চলে যাওয়াই চাই। যাবেও চলে। নইলে জগতের ক্রমোন্নতির কোন মানে থাকে না! ভগবান তাহলে সেই সেকালের রাক্ষসের রাজ্য বজায় রাখতেন, যেখানে সবাই সবাইকে ধরে খাওয়ার জন্য ওত পেতে বসে থাকত।

আমি যতটা লিখেছি তার থেকেই বুঝতে পারছ, যে অনেক অনেক হাজার বছর লেগেছে প্রকৃতিকে ও মানুষকে এখনকার অবস্থায় এসে পৌঁছতে। উন্নতি প্রথমটা খুব ধীরে ধীরে হয়েছিল। কিন্তু মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি পাকবার পর থেকে, অর্থাৎ গত এক হাজার দু হাজার বছরে পৃথিবী হুহু করে এগিয়ে এসেছে। এই সময়ের মধ্যে মানুষ জড়-প্রকৃতির সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধে মেতেছে, আর প্রকৃতির শক্তিগুলোকে দাসী বাঁদী করে নিজের কাজে জুড়ে দিয়েছে। ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধে, ধর্ম্ম অধর্ম্ম সম্বন্ধে, বড় বড় কথাগুলো অন্ততঃ-পক্ষে মুখে বলতেও শিখেছে।

প্রাণী ও উদ্ভিদ

এইবার তোমাদিগকে বোঝাই, যে প্রকৃতি বলতে কি বোঝায়। প্রকৃতির আর একটা নাম স্বভাব। তোমাদের চারিদিকে যা কিছু দেখছ, সূর্য্য চন্দ্র থেকে আরম্ভ করে বালির কণাটী পর্য্যন্ত, মানুষ থেকে আরম্ভ করে মশা মাছিটী পর্য্যন্ত, বট গাছ থেকে আরম্ভ করে শেওলা পর্য্যন্ত, একেই বলে প্রকৃতি। সাবেক কালে লোকে বলত, যে প্রকৃতি পঞ্চভূত দিয়ে গড়া। এই পঞ্চভূত কি কি, জেনে রাখা ভাল। মাটি, জল, হাওয়া, আকাশ আর আগুন, এই পাঁচটী জিনিস। মাটি বলতে বুঝতে হবে সব কঠিন পদার্থ, জল মানে সব তরল জলীয় পদার্থ, হাওয়া মানে সব ধোঁয়াটে পদার্থ, আগুন মানে সব রকমের শক্তি বা তেজ, আকাশ মানে শূন্য অর্থাৎ খালী জায়গা।

আকাশ ও আগুনের কথা পরে হবে। বাকী যা কিছু তোমাদের চোখের সামনে দেখছ তাকে আমি তিন ভাগ করি।

(১) জড় পদার্থ—যার নড়া-চড়া নেই—চেতনা বা প্রাণ নেই—যেমন পাথর, জল, বায়ু ইত্যাদি।

(২) উদ্ভিদ—গাছ-পালা—যার প্রাণ আছে, জন্ম বাড়ও, মরণ আছে, কিন্তু বোধ-শক্তি নেই।

(৩) প্রাণী—চেতন পদার্থ—মানুষ, জানোয়ার, পাখী, সাপ, মাছ, পোকা মাকড়, ইত্যাদি। এদেরও প্রাণ আছে, জন্ম বাড় ও মরণ আছে। উপরন্ত আর একটা গুণ আছে, বোধ শক্তি, যা গাছ-পালারও নেই জড় পদার্থেরও নেই।

আমি মোটামুটি এই তিন ভাগ করলাম। কিন্তু এমন অনেক জিনিসও আছে, যাকে জড় বলব, কি উদ্ভিদ বলব, কি প্রাণী বলব, তা ঠিক করা শক্ত। তবে সে সব জিনিস তোমাদের চোখে পড়ার সম্ভাবনা নেই।

যে সব পদার্থ তোমরা সচরাচর দেখ, এখন তারই কথা বলি। প্রাণীদের একটা বিশেষত্ব এই, যে তারা নড়তে পারে, চলতে পারে। নানা রকমের চলা আছে। পাখী ও মানুষ চলে দুপায়ে, বাঘ ঘোড়া চলে চার পায়ে, মাছি চলে ছ পায়ে, তেঁতুলে-বিছে ও কেওাই চলে অনেক পায়ে, আর সাপ কেঁচো চলে বুকে হেঁটে। মাছ ডাঙায় চলে না, কিন্তু জলে চলে। পাখী, মাছি, মশা আবার হাওয়াতেও উড়ে।

উদ্ভিদ প্রাণীদের মতন চলতে পারে না, কিন্তু ছোট থেকে বড় হয়। খুব সূক্ষ্ম এমন যন্ত্র আছে, যা দিয়ে ওদেরও নানা রকম নড়ন-চড়ন ধরা যায়। কিন্তু লজ্জাবতী লতার মতন গাছের নড়া ত তোমরা খালী চোখেই দেখতে পাও! তার ডাল ছুঁলেই পাতাগুলো জড়সড় হয়ে নুইয়ে পড়ে। শুধু ছুঁলে কেন, তোমার নাকের নিঃশ্বাস লাগলেও পাতার ঐ অবস্থা হবে। এটা হচ্ছে

লজ্জাবতী

লজ্জায় নুইয়ে পড়েছে
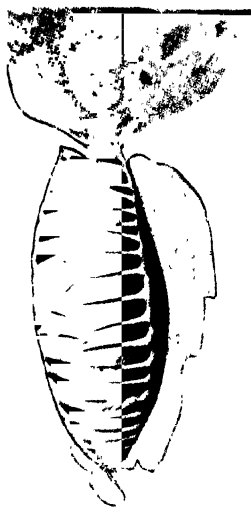
পোকা ধরবার জাঁতিকল

পোকা ধরবার ফাঁদ

কেন জান ত! ঐ রকমে গাছ নিজেকে রক্ষা করে। পাতা নুইয়ে পড়লে ডালের কাঁটাগুলো সামনে খাড়া হয়ে থাকে, আর পোকা মাকড় যারা পাতা খেতে এসেছে তারা ভয়ে পালায়।

আবার, এমনও গাছ আছে যারা পোকা শিকার করে খায়। গাছের হাত পাও নেই, মুখও নেই, শিকার করে খায় কি উপায়ে? শোন, বুঝিয়ে বলি। কারও বা ডালে ডালে লাগান যাঁতিকলের মতন যন্ত্র আছে, তাইতে পোকা মাকড় বসলেই বন্ধ হয়ে যায়। কারও বা পাতার কাছে একটা থলির মতন ঝুলছে তার ভেতর মাছি ঢুকলে আর বেরোতে পারে না, ডালা বন্ধ হয়ে যায়, পোকাগুলো মরে গেলে তাদের দেহের সমস্ত সার পদার্থ, গাছটা নিজের দেহের মধ্যে শুষে নেয়। তবে গাছগুলো প্রধানতঃ নিরামিষ-ভোজী, জীবহিংসা করে না। বিছুটি, চোর কাঁটা, এরা যে তোমাকে কামড়ায়, সে কেবল নিজের প্রাণ বাঁচানর জন্য।

তাহলে দেখলে ত, যে প্রাণী আর উদ্ভিদ, দুয়েরই নড়বার চড়বার শক্তি আছে, কিন্তু জড় পদার্থের নেই। বালি ওড়ে বটে, জলে ঢেউও ওঠে, কিন্তু সে তার নিজের শক্তিতে নয়, হাওয়ার জোরে। জড় পদার্থকে তাহলে অচল বলা যেতে পারে। জড়ের সেরা যে পর্ব্বত, তার ত ঐ একটা নাম! আচ্ছা এই যে চল আর অচলের তফাৎ, এটা কিসের জন্য? অচলের কি নেই, বল দেখি। ওর প্রাণ নেই! তাই বাড়েও না, নড়েও না।

প্রাণী কি গাছপালা, এদের প্রাণটা বার হয়ে গেলে, এরাও হয়ে যায় জড় পদার্থ। তখন এদের

অদ্ভূত যন্ত্র আছে, সেগুলো সব বন্ধ হয়ে যায়। এরা আর বাড়েও না, নড়েও না। হয়ে যায় অচল। গাছের গুঁড়ীর তক্তাও অচল, গরু মহিষের চামড়ার জুতোও অচল। অথচ এককালে তাদের প্রাণ ছিল, নড়া-চড়া ছিল।

প্রাণীর আর উদ্ভিদের আর একটা মস্ত গুণ আছে, যা জড়ের নেই। সেটা হচ্ছে ফল-প্রসব। নিজের দেহের সামান্য একটু অংশ থেকে ওরা নূতন প্রাণী স্থষ্টি করে। একবার স্থষ্টি হলে, তার পর সেই চারা কি বাচ্চা জড়-প্রকৃতি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে আপন শক্তিতে বাড়তে থাকে। এই ফল প্রসব এক অদ্ভূত ব্যাপার! কত রকমে যে হয়, তার ঠিকানা নেই! আমরা সাধারণতঃ যে সব জন্তু দেখি তাদের জন্ম হয় বাপ-মা দুজনের শরীরের সামান্য সামান্য অংশ একত্র হয়ে। অনেক গাছ আছে, যাদেরও এই একই নিয়ম। সেই সব গাছে দুরকম ফুলের রেণু হয়, পুরুষ আর স্ত্রী। এই দুই রেণু এক হলে ফল ধরে, নইলে ধরে না। হাওয়াতে উড়ে হোক, কি মৌমাছির পায়ে পায়ে হোক, পুরুষ রেণু গিয়ে স্ত্রী রেণুর সঙ্গে মেশে। তার পর ফল প্রসব হয়।

কিন্তু সর্ব্বত্র এ নিয়ম নয়। প্রাণীই এমন সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আছে, (তাদের নাম জীবাণু) যাদের দেহটা আপনা থেকে দুভাগ হয়ে গিয়ে একটার জায়গায় দুটো প্রাণীর স্থষ্টি হয়। এই রকম একটা জীবাণুর জন্ম-কথা তোমাদিকে বলব। তার নাম এমিবা। এই জীবাণু এত ছোট যে, একে খালী চোখে দেখা যায় না। এ রকম জিনিস দেখবার এক যন্ত্র আছে। তার নাম অণুবীক্ষণ।

অণুবীন যন্ত্র

তোমরা তাকে অণুবীণ বলতে পার। দূরবীণ জান ত, যাতে দূরের জিনিস কাছে দেখা যায়? এ যন্ত্রও কতকটা সেই ধরণের। চশমাতে যে রকম কাচের পরকলা লাগায়, সেই রকম দু তিনটা পরকলা চোঙ্গার ভেতর লাগিয়ে এই অণুবীণ তৈরী হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যেই আজ পণ্ডিতরা জীবাণু সম্বন্ধে কত কথা জানতে পেরেছেন। নইলে আগে এ বিষয়ে লোকের আন্দাজী-জ্ঞান ছিল মাত্র।

অণুবীণের চোঙ্গার নীচে এক টুকরো কাচের উপর একটা এমিবা রাখলে দেখাবে যেন একটা ছোট্ট গোল-গাল কেঁচো। তার না আছে হাত পা, না আছে চোখ মুখ। কিন্তু তার গায়ের কাছে কাচের উপর একটু তেজাব কি এসিড লাগিয়ে দিলে সে তার গাটা তৎক্ষণাৎ কুঁচকে নেবে, পাছে তেজাবে পুড়ে যায়। তার কাছে খাবার দ্রব্য এক কণা রেখে দিলে সে তার দেহের একটু অংশ সেই দিকে প্রথমে বাড়িয়ে দেবে। তার পর সমস্ত দেহটা ঘসটে এগিয়ে নিয়ে যাবে। শেষ সেই খাবারের কণাটাকে ঢেকে ফেলে তার উপর পড়ে থাকবে। দেখতে দেখতে খাবারটা খেয়ে ফেলবে। তোমরা বলবে মুখ নেই, খায় কি করে? কেন, সমস্ত দেহটাই তার মুখ, খাওয়ার ভাবনা কি!

কিছুক্ষণ এই এমিবাকে পাহারা দিলেই দেখা যাবে যে সেটা কি রকম লম্বা হয়ে যাচ্ছে, আঙুলের মত কি সব বেরোচ্ছে চারিদিকে। তারপর হঠাৎ দেহটা দু ভাগ হয়ে গেল। দুটো এমিবা এল, যেখানে একটা ছিল। শরীর দুটো গুটিয়ে ফের আগের মতন গোলগাল হয়ে গেল।

আবার এমন প্রাণীও আছে (একটার নাম পলিপ) যাকে ছুরী দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে দিলে, প্রত্যেকটা টুকরো এক এক নূতন প্রাণী হয়। ধড়টার নূতন মাথা গজায়। মাথাটার নূতন ধড় হয়। "রক্তবীজের ঝাড়" কথাটা শুনেছ ত? এ যেন তাই। শামুকের মতন দু চারটে জলজন্তু আছে, তার পা কি ল্যাজ কেটে দিয়ে দেখা গেছে যে আবার নূতন পা ল্যাজ গজিয়ে উঠেছে।

আর এক ব্যাপার আছে। কোন কোন উদ্ভিদের কি জীবের, দেহের উপর গুটীর মতন বেরোয়। সেই গুটীগুলো খসে গিয়ে নূতন নূতন প্রাণীর জন্ম হয়। আপনা থেকেই এটা হয়। ফার্ণ, যাকে বাঙ্গালায় ঢেঁকী শাক বলে, জান কি? তার পাতায় গুটী বেরোয়। প্রাণীর মধ্যে এফিস বলে এক পোকারও গায়ের গুটী থেকে বাচ্ছা হয়। এই এফিস এক ছোট্ট উকুনের মত পোকা, বাগানে গাছ-পালা নষ্ট করে।

তারপর ধর, কলমের গাছ। মালীরা ফল ফুলের গাছের ডালে একটা গাঁট বেছে নিয়ে কলম বাঁধে দেখেছ ত! কিছুদিন পরে সেইটে কেটে মাটিতে পুঁতে দেয়, নূতন গাছ হয়। এই উপায়েও এক গাছের অনেক বাচ্চা হতে পারে।

এই কলম বাঁধার কথা থেকে মনে হল, বিলেতে নানা রকম নূতন ফল সৃষ্টি করবার এক উপায় বেরিয়েছে। একটা ফলের কলম কেটে অন্য রকম ফলের গাছে বাঁধলে যে নূতন ফল পাওয়া যায়, সেটা না এটা না ওটা, হয়ত দুটোর চেয়েই উৎকৃষ্ট ফল। বুঝতে পারলে কথাটা? ধর, এক ভাল আম গাছের কলম

কেটে বেঁধে দেওয়া হল পেয়ারা গাছে। কলম যদি লাগে, কে জানে, হয়ত পেয়ারা-গন্ধ আম ফলবে, যার পেটে আঁটি নেই, আছে ছোট ছোট বীজ।

তোমরা সচরাচর যে জবাফুল দেখ, তার রঙ ত জল-জলে রাঙা! অথচ আলিপুর সরকারী ফুলের বাগানে দেখতে পাবে, কলম বাঁধার ফন্দী করে কত রকম রঙের জবাফুল করেছে।

প্রাণীর ও উদ্ভিদের ফল-প্রসব অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার!

প্রাণশক্তি প্রথম কি করে এসেছিল, তা জানা যায় না। অন্ততঃ কেউই ঠিক বলতে পারে না। তবে এটা নিশ্চিত যে, প্রাণী থেকেই প্রাণীর উৎপত্তি হয়, জড় পদার্থ থেকে হয় না। আগেকার দিনে মানুষে পচা জিনিসে পোকার জন্ম দেখে নানা কথা বলত। কিন্তু এখন অণুবীণ যন্ত্রের কল্যাণে সব পরিষ্কার বোঝা গেছে। হাওয়াতে যে সব জীবাণু আছে, তাদের ছোঁয়াচ থেকে বাঁচাতে পারলে কোন বাসি জিনিসেই পোকা পড়বে না। কৌটায় খাবার দ্রব্য রেখে, দমকল দিয়ে তার হাওয়া বের করে নিয়ে, কৌটার মুখ ঝালিয়ে দিলে, সে খাবার কখনও পচবে না। সাহেবেরা এই উপায়ে কৌটায় বন্ধ করা মাছ, মাংস, তরী-তরকারী, এমন কি দুধ-মালাই পর্য্যন্ত, নিজের মুলুক থেকে আনিয়ে কত কাল রাখেন!

আমাদের দেশেও এই রকম করে ফল, মোরব্বা, মেঠাই, মাছ ইত্যাদি বন্ধ করে আজকাল বিদেশে চালান করা হচ্ছে।

অতি ছোট্ট জীবাণু হতে আরম্ভ করে মানুষ পর্য্যন্ত যত প্রাণী আছে, তাদের প্রাণ-শক্তি সৃষ্টির আদি থেকে এক মহানদীর

স্রোতের মতন বয়ে চলেছে। বিরাম নেই। প্রাণীর রূপ প্রকৃতির প্রয়োজন-মত বদলে বদলে গেছে, কিন্তু প্রাণটা সেই পুরানো প্রাণ, যা চিরদিনই রয়েছে।

আগেই বলেছি যে প্রাণী মাত্রেরই দেহ জড় পদার্থ দিয়ে তৈরী। তাই আমাদের দেশে কথায় বলে, শুনেছ ত, মানুষ মলে তার দেহ পঞ্চভূতে মিলিয়ে যায়। মায়ের পেটে যেই ছেলে জন্মায়, কি প্রকৃতিদেবী নিজের দেহ থেকে মাল-মশলা দিয়ে সেই ছেলেকে বড় করতে থাকেন। যত দিন ছেলে মায়ের পেটে থাকে, কি মায়ের দুধ খায়, তত দিন মা প্রকৃতির কাছ থেকে মাল-মশলা সংগ্রহ করে ছেলেকে দেন। তার পর ছেলে নিজেই সে কাজ হাতে তুলে নেয়। জড়-জগৎ থেকে সে পায়, প্রধানতঃ নিঃশ্বাসের হাওয়া আর পেটের অন্ন। এ দুটোর যে কোনটার অভাব হলেই প্রাণ যাবে। আর এ দুটো পেলে শুধু যে বাঁচবে তা নয়, বড় হতে থাকবে। হাওয়া আর অন্ন থেকে যেটুকু দরকার টেনে নিয়ে বাকীটা শরীর আবার প্রকৃতির কাছে ফেরৎ দিচ্ছে। এই দরকার যে শুধু বাড়ের জন্য তা ত নয়। মানুষ জোয়ান হলেই তার বাড় বন্ধ। কিন্তু নড়তে চড়তে শরীরের পেশীগুলোর যে ক্ষয় হয়, খাদ্য থেকে সে ক্ষয়ও ভরিয়ে নিতে হয় ত! যত দিন বেঁচে থাকবে, ক্ষয় সমানে চলবে। তাই খাওয়া-দাওয়া পুরো মাত্রায় বজায় রাখতে হবে। আর সেই খাবার হজম করবার জন্য পরিষ্কার হাওয়া নাক দিয়ে নিতে হবে।

নিঃশ্বাসের হাওয়াটা তার কাজ করে, আবার বেরিয়ে আসে প্রশ্বাস হয়ে। প্রাণীরা দিবারাত্র হাওয়া নিচ্ছে আর ছাড়ছে।

উড়ন্ত গোধা বা চামচিকির অতিকায় পূর্ব্বপুরুষ
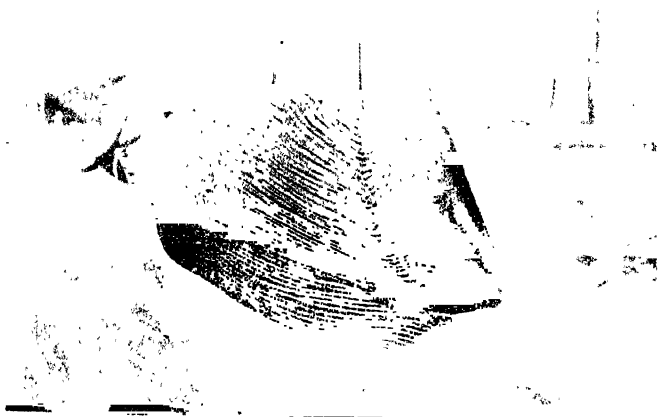
কিন্তু যেটা নিচ্ছে, আর যেটা ছাড়ছে, এ দুটো এক পদার্থ নয়। নাকের ভেতর যায় অক্সিজেন বা প্রাণবায়ু। যখন বেরিয়ে আসে তখন সেটা কয়লা-পোড়া ধোঁয়া বই আর কিছু নয়। এ যেন স্যাকরার চুলোর ব্যাপার। হাপরে করে স্যাকরা তাকে ক্রমাগত অক্সিজেন খাওয়াচ্ছে, কিন্তু সেটা যখন চুলো থেকে বেরিয়ে আসছে, তখন সেটা কয়লার ধোঁয়া। পরে এ কথা আবার বলব। কিন্তু এখন গাছেরা কি করে তা শোন।

এই যে ধোঁয়া নাক দিয়ে বের হচ্ছে, প্রাণীর আর এটা দরকার নেই। কোন প্রাণীকে ধোঁয়ায় ডুবিয়ে রাখলে সে দম আটকে মরে যাবে। কিন্তু উদ্ভিদের একেই দরকার। উদ্ভিদ এই ধোঁয়া ভেতরে টেনে নিয়ে তার কয়লার ভাগটা রেখে দেয়, আর বিশুদ্ধ প্রাণবায়ুটা বাহিরে ছেড়ে দেয়। এই হচ্ছে উদ্ভিদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস। প্রাণীদের ঠিক উল্টো। তাহলে বোঝ, প্রাণী আর গাছপালা কেমন সুন্দর ভাবে পরস্পরকে সাহায্য করছে, আর আকাশের প্রাণবায়ুর পরিমাণ ঠিক রাখছে। কমছেও না বাড়ছেও না। এই সবের জন্যই ত সংসারকে নিয়মের রাজ্য বলে।

কিন্তু এ কথা মনে কোরো না যেন, যে গাছপালা এই ধোঁয়াটুকু নিয়েই বেঁচে থাকে। প্রাণীদের মতন এদেরও নানা রকম খোরাক দরকার। এই সব দরকারী পদার্থ এরা মাটি থেকে, আকাশ থেকে টেনে নেয়। এদের শিকড় ও পাতাগুলো নিয়ত এই কাজ করছে।

শিকড় মাটি থেকে নানা রকম নুন ও জল শুষে নিচ্ছে, আর পাতা হাওয়া থেকে কয়লার ধোঁয়া টানছে। গাছের দেহের

প্রধান ভাগই হচ্ছে কয়লা। এটা ত তোমরা সহজেই আন্দাজ করতে পার। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, সেই কয়লা প্রায় সবটাই আসে হাওয়া থেকে। বেশ রোদ না পেলে, পাতাগুলো এই কয়লা তৈরীর কাজ করতে পারে না। তাই ধানের ক্ষেতেই হোক্, কি ফুলের বাগানেই হোক্, প্রচুর রোদ চাই। পাতায় এক রকম সবুজ রস আছে, তার নাম ক্লোরোফিল। সেই রসই হাওয়া থেকে কয়লা বার করে নেয়।

শিকড়গুলো মাটি থেকে যে রস টেনে তোলে, সেটা ক্রমশঃ গাছের সমস্ত দেহে চড়ে যায়। এই রসের নাম স্যাপ্। গাছের গোড়ায় যত সার দেবে, তত এই স্যাপের জোর হবে। কিন্তু আওতায় গাছ বাড়বে না। রোদের সাহায্যে সবুজ-রস কয়লা জোগাবে, তবে ত গাছ সুস্থ সবল হবে! নইলে হবে না, যতই গাছের গোড়ায় সার ঢাল।

একটা উদাহরণ দিয়ে তোমাদিকে এটা বুঝিয়ে দিই। বাঁশগাছ কেমন সুন্দর বড় হয়, তার গুঁড়ী ডালপালা কত শক্ত, মানুষের কত কাজে লাগে, তা তোমারা সবাই জান। আচ্ছা, রোদ হাওয়া বন্ধ করে দেখ, কি হয়! ধর, প্রথম যখন গাছের কল বেরিয়েছে, তখন তাকে একটা হাড়ী দিয়ে বেশ করে ঢেকে দিলে। এর ফল কি হবে? মাটি থেকে শিকড় নুন জল টানছে, কিন্তু রোদ হাওয়া একেবারে বন্ধ। রোদ হাওয়া যখন বন্ধ, তখন কয়লা সরবরাহ বন্ধ। গাছ বাড়বে কি করে! কিছুদিন পরে দেখবে হাড়ীটা ফেটে গেল, আর তার ভেতর থেকে বের হল একটা গোলগাল নরম শালগম মুলোর মতন জিনিস। এই

বাঁশের কোঁড় খেতে অতি উপাদেয়, কিন্তু একে ত আর গাছ বলা যায় না! এর দেহই নেই।

এইবার একটা প্রাণীর দেহ নিয়ে তার প্রধান ভাগগুলো তোমাদিকে বোঝাব। ভাগগুলো কি রকম ভাবে সাজান আছে, প্রত্যেক ভাগ কি কাজ করছে, এই সব অল্প কথায় বলব। দেখবে যে কি আশ্চর্য্য যন্ত্র এই প্রাণী-দেহ, কত রকম কাজ চলছে এর ভেতর। কি লাগে এর কাছে মানুষের তৈরী কোন কল।

তোমাদের জানা প্রাণীদের বেশীর ভাগেরই আমাদের মতন শির-দাঁড়া আছে। বেশীর ভাগই ছোট্ট বেলায় আমাদের মতন মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়েছে। তাই আমার মনে হয় যে মানুষের দেহের বর্ণনা করলেই অধিকাংশ জন্তুর ভেতরটা তোমরা বুঝতে পারবে।

মানুষের দেহ বলতে মাথা-সুদ্ধ ধড়, আর ডাল-পালা। ডাল-পালা মানে আঙ্গুল-সুদ্ধ দুই হাত, আর আঙ্গুল-সুদ্ধ দুই পা। ডাল পালা কিন্তু সব প্রাণীর এক রকমের নয়। পাখীর, বাদুড়ের, চামচিকের, হাত নেই ডানা আছে। নানা জাতের জলজন্তু আছে, যাদের পেছনের পা দুটো হয়ে গেছে একটা মাছের মতন ল্যাজ। মাছের হাত পা নেই, তার বদলে আছে, যাকে বলে, পালক-কাঁটা। তেলা পোকা, ঘুর-ঘুরে পোকা এদের দুজোড়া ডানা আছে, তা ছাড়া আবার পা। এ সব কথা এখন থাক, মানুষের দেহের কথাই বলি শোন।

আচ্ছা, তোমরা জান ত, যে শরীরের ভেতরে একটা শক্ত হাড়ের কাঠাম আছে! সেই কাঠামটা ঢাকা মাংস দিয়ে, আর

মাংস ঢাকা চামড়া দিয়ে। এই ত হল মোটামুটি আমাদের দেহ-ঘর। আমাদের দেশে একে কথায় বলে নয়-দোয়ারী ঘর। দোয়ারগুলোর নাম করি। মুখ, দুই চোখ, দুই কাণ, দুই নাসা, মল মূত্র দ্বার। এ ছাড়া সর্ব্বাঙ্গে চামড়াতে ছোট্ট ছোট্ট জানালা আছে। এই জানালাকে বলে লোম কূপ। এইগুলো দিয়ে শরীরের খানিকটা ময়লা বেরিয়ে যায় ঘাম হয়ে।

আত্মা-পুরুষের খাস-কামরা মাথাটা। সেই মাথার খুলীর ভেতর আছে মগজ বা ঘিলু। সেই ঘিলু মাথা থেকে বরাবর নেমে গেছে শিরদাঁড়ার ভেতরে এক সরু নলী দিয়ে ল্যাজের গোড়া পর্য্যন্ত। অবশ্য আজ আর মানুষের ল্যাজ নেই, কিন্তু সে জায়গাটা ত আছে! মানুষের যা কিছু বোধ-শক্তি তার বাসস্থান হচ্ছে মগজ আর শিরদাঁড়ার ঘিলুর মধ্যে।

সেকালে মানুষের মাথায় বুদ্ধি গজানর কথা তোমাদিকে আগেই বলেছি। মানুষের মগজের সঙ্গে পশুর মগজের তুলনা করলেই এই বুদ্ধির চিহ্ন দেখতে পাবে। মানুষের মগজ যেন ধনী মানুষের ঘর, যেমন বড় তেমনি চিত্র-বিচিত্র। পশুর মগজ যেন গরীবের কুঁড়ে, ছোট্টটী আর একেবারে সাদাসিধে।

শরীরের নানা ভাগকে অবয়ব বলে। মগজের সঙ্গে প্রত্যেক অবয়বের যোগ আছে সরু সরু শিরা দিয়ে। ধর, মাথাটা মনে করলে, দূরে ওটা কি? চোখকে হুকুম করলে, দেখ ত হে কি ওটা। চোখ দেখে এত্তেলা দিলে, হুজুর ওটা গাছ, কিন্তু কি গাছ বুঝতে পারছি না। মাথা ভাবলে, আচ্ছা, কাছে গিয়ে দেখা যাক্। পাকে হুকুম করলে, চলত হে কাছে। পা চলল। কাছে
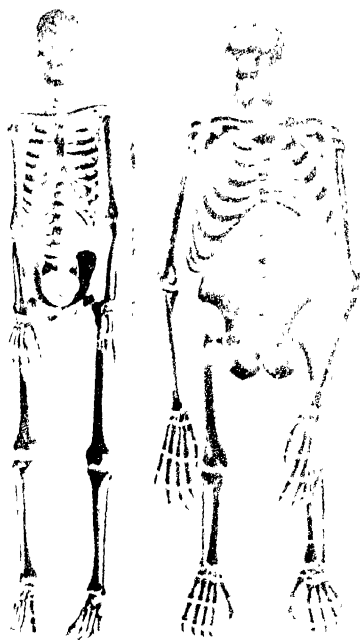
মানুষ ও বন-মানুষের পঞ্জর

পেশীর কাজ

গেলে পর, চোখ আবার দেখলে, নাক গন্ধ শুঁকলে, হাত ডাল ছুঁয়ে দেখলে কাঁটা। তখন স্থির হল গোলাপের গাছ।

এই ভাবে সমস্ত অবয়ব, সমস্ত ইন্দ্রিয় মাথার হুকুম তামিল করে। কখনও, না, বলে না। কিন্তু মাথা যদি না ভেবে চিন্তে যা-তা হুকুম দেয়, তার ফলও সে ভোগে হাতে হাতে। ধর, রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে এক জায়গায় দেখা গেল যে পথে এক বড় নালা, আর নালা পার হওয়ার তক্তাটা গেছে ভেঙে। মাথা এদিক ওদিক কিছু না ভেবে পাকে হুকুম দিলে, মারো লাফ। মস্ত নালা, লাফ দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু পা ত কখন পাল্টা জবাব দেবে না! কোমরের সাহায্য নিয়ে পা দুটো "হেঁইও মারি, জোয়ান" করে দিলে এক লাফ, কিন্তু ওপারে পৌঁছল না। সমস্ত দেহটা পড়ল খানায়। কোমরে লাগল চোট, পা গেল ভেঙে। তখন মাথা বুঝলে, বোকামি হয়ে গেছে। এ রকম হয় বই কি! সব মগজই ত আর বুদ্ধির ঢেঁকী নয়। এই প্রকার কাণ্ড করলে অন্য লোকে বলে, ব্যাটা যেন গাড়ল। অর্থাৎ মানুষ হলে কি হয়, এর মগজ পশুর মগজের তুল্য।

মগজের নানা ভাগ আছে। তার কোনটা থেকে চোখ হুকুম নেয়, কোনটা থেকে কান, কোনটা থেকে হাত। প্রত্যেক অবয়বের একটা করে আপিস আছে। চোখের আপিস বেগড়ালে দেখার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। হাতের আপিস বেগড়ালে হাতে পক্ষাঘাত হয়। এই রকম।

পুতলা নাচ দেখেছ তোমরা? পুতুলগুলোর হাতে পায়ে নানা স্থানে সুতো বাঁধা আছে। মালিক সেই সুতো টেনে টেনে

পুতুলের হাত, পা, কোমর, ঘাড় ইচ্ছামত বাঁকাতে নাড়াতে পারে! আচ্ছা, আমাদের হাত পা নড়ে কি করে? আমাদের শরীরের উপর যে মাংস ঢাকা আছে, তা পেশীতে ভরা। পেশী কাকে বলে জান? তোমাদের হাতের গুলি, পায়ের ডিম, এই রকম যে সব মাংস চাড় পড়লেই শক্ত হয়, আবার নোল দিলেই নরম হয়ে যায়, তাকে বলে পেশী। ইংরেজী নাম মস্ল্, হয়ত তোমরা শুনে থাকবে। প্রত্যেক পেশী দুদিকে তাঁতের মতন শিরা দিয়ে হাড়ের জোড়ের সঙ্গে বাঁধা। মস্ল্ ইচ্ছামত লম্বা খাটো করা যায়। আমাদের দেহের মালিক খাস কামরায় বসে হুকুম করলেই মস্ল্ কুঁকড়ে যায়, আর তার সঙ্গে বাঁধা জোড়টাকে টেনে মুড়ে দেয়। এ পর্য্যন্ত ত পুতুলো নাচের মতনই হল। কিন্তু আমাদের বুকের পেটের ভেতরে অনেক পেশী আছে, যারা আপনা থেকে কাজ করে যাচ্ছে, খাস হুকুমের দরকার হয় না। এ ব্যবস্থা যদি না থাকত, তাহলে মানুষ ঘুমিয়ে পড়লেই তার রক্ত চলাচল, হজমের কাজ, সব বন্ধ হয়ে যেত। ফলে মানুষটা মরে যেত। চব্বিশ ঘণ্টাই ত আর জেগে বসে কল চালাতে পারে না! তার পর দেখ, হঠাৎ ধুলো উড়লে চোখের পাতা কেমন আপনা থেকে বন্ধ হয়ে যায়, মগজকে হুকুম করতে হয় না। এ সব ব্যবস্থা ত আর নাচের পুতুলের বেলা করা যায় না।

পিঠের দিকে যেমন শিরদাঁড়া, সামনের দিকে তেমনি পাঁজরা। এই পাঁজরার খাঁচাটার উপর-তলায় নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কল, আর নীচে তলায় খাবার হজমের কল থাকে। এই দুই কলের সব ভাগগুলোর নাম যদি করি, ত তোমাদের ঠিকে-ভুল

হয়ে যাবে। তাই মোটামুটি বুঝিয়ে দেব যে শরীরের এই দুই ব্যাপার কি করে চলছে।

উপর তলার দুটী প্রধান যন্ত্র কলিজা আর ফুস্‌ফুস্‌ বা ফোঁপরা। কলিজা হচ্ছে দেহের দমকল। দিবা-রাত্র ধুক্ ধুক্ ধুক্ ধুক্ করে রক্ত শিরায় শিরায় চালাচ্ছে। এর গড়ন নোনা আতার মতন। দুটী ফুস্‌ফুসের মধ্যখানে এর স্থান। নাক দিয়ে আমরা যে প্রাণবায়ু টেনে নিচ্ছি, সেটা প্রথমে ফুস্‌ফুসে চলে যায়। তার পর রক্তের সঙ্গে মিশে শিরায় শিরায় ঘোরে। এই রকম ঘুরতে ঘুরতে রক্তের ময়লা কেটে যায়। পরিষ্কার লাল টুক্‌টুকে রঙ হয়। রক্তের ময়লা পুড়িয়ে দিয়ে প্রাণবায়ু যখন বেরিয়ে আসে তখন সে আর অক্সিজেন নেই। তোমাদিকে আগেই বলেছি যে তখন সে কয়লা পোড়া ধোঁয়া হয়ে গেছে। আমাদের বৈদ্যেরা এই ধোঁয়ার নাম দিয়েছেন অপান বায়ু। আর হাওয়া যখন রক্তের সঙ্গে সমস্ত দেহে ঘুরছে, তাকে তাঁরা বলেন সমান বায়ু। নামগুলো বেশ সুন্দর, তাই তোমাদিকে বললাম।

অক্সিজেনের কথা আবার পরে বলতে হবে। এখন মোটামুটি এইটুকু জেনে রাখ যে, কোন পদার্থের সঙ্গে অক্সিজেনের যোগ হলেই সে পদার্থ একটু তেতে ওঠে। আমাদের নাক দিয়ে যে হাওয়া বেরোয়, সেটা গরম। যতক্ষণ প্রাণ আছে, দেহটাও গরম। নিঃশ্বাস বন্ধ হলে, দেখতে দেখতে হিম হয়ে যায়। তখন আর তাপ কোথা হতে আসবে!

এই শরীরের তাপ আর বুকের ধুক্‌ধুকুনি, এই প্রাণের লক্ষণ। এ দুটো মাফিকসই থাকলেই বুঝতে হবে যে শরীর ভাল

আছে। তাই ত ডাক্তার বাবু এসেই আগে নাড়ী দেখেন, বুকে চোঙ্গা লাগান, আর জরকাঠি দিয়ে দেহের তাপটা দেখে নেন।

এখন দেখা যাক, যার জন্য এই ধুকুধুকুনি আর এই তাপ, সেই রক্ত আসে কোথা থেকে। আগেই ত বলেছি, আমরা যা খাই, তার থেকে শরীরের হাড় মাস রক্ত গড়ে ওঠে। খাদ্যটা কি করে রক্ত হয়, সেটা তোমাদের মোটামুটি জানা দরকার। ধর, মানুষ এক গরাস ভাত দাল তরকারী মাছ মিলিয়ে মুখে পুরলে। দু পাটি দাঁত তৈয়ের আছে। তারা তৎক্ষণাৎ লেগে গেল নিজের কাজে। জিবের সাহায্যে খাবারগুলোকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে টুকরো টুকরো করে পিষে ফেললে। চিবোতে চিবোতে মুখের নাল বেরোতে লাগল। সেই নাল খাবারের মণ্ডের সঙ্গে মিশে খানিকটা খাবার গলিয়ে দিলে। যে ভাগটা এই রকম মুখেই গলে যায় সেটা প্রধানতঃ ভাত, আলু ইত্যাদি। বাকীটা নালের সঙ্গে পিষে পিষে ডেলা পাকিয়ে গেছে।

তারপর, এই জলীয় পদার্থ আর এই ডেলা আস্তে আস্তে গলার নলী দিয়ে নেমে হজমের থলীতে ঢুকল। এই থলীর ভেতর এক রকম খুব টক জারক রস বেরোয়। তার সঙ্গে মিশে মণ্ডটা খুব তোলাপাড়া করতে থাকল খানিকক্ষণ। শেষ মাছ, দাল, এই রকম অনেকগুলো জিনিসের টুকরো এই জারকরসে গলে গেল! মুখের থেকে নেমে এসেছে যে মিষ্টি রস, আর এই নূতন টক রস, এই দুটো রসকে এইখানেই থলীর বাহিরের শিরাগুলো চুষে নিয়ে রক্তের সামিল করে দিলে।

বাকী যা রইল, তরকারীর ছিবড়ে, তেল চরবী ইত্যাদি, সেগুলো কাইয়ের মত হয়ে ধীরে ধীরে নীচের আঁতড়ীর মধ্যে চলে গেল। সেখানে আছে তেতো পিত্তরস আরও দুই এক রকম রস! তার সঙ্গে খুব নাড়াচাড়া পেয়ে খাবারের আরও খানিকটা গলে গেল। সেটাও ফিরে এল ঘোরা পথে শরীরের পুষ্টির জন্য। যা পড়ে রইল, তার আর কোন কাজ নেই। সেটা চলে গেল পেছনের দিকে।

তলপেটের কতকগুলো যন্ত্রের নাম তোমরা নিশ্চয় জান। মাছের, পাখীর, পাঁঠার, নিশ্চয় দেখছ। লিবর (মেটুলি), পিলে, তিল্লী, এরা এই হজমের ব্যাপারের শেষের দিকটাতে নানারকম জারক রস দিয়ে সাহায্য করে।

আর আমার বেশী কিছু বলবার নেই। কিন্তু একটা কথা বুঝেছ ত, যে দেহের ভেতরটা বেশ পরিষ্কার না রাখলে যন্ত্রগুলো ঠিক চলবে না। এ ত সব যন্ত্রেরই নিয়ম! তাই শরীরের ময়লাগুলো যাতে নিয়মিত বেরিয়ে যায় সেটার উপর সদা-সর্ব্বদা নজর রাখতে হবে। ময়লা বেরিয়ে যায় তিন পথে। মল মূত্র হয়ে, আর ঘাম হয়ে। মানুষ যখন স্বাভাবিক ভাবে থাকে, তখন এ তিনটে কাজই আপনা হতে হয়। কিন্তু যারা শহরে বাস করে, তাদের বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার। তার অনেক কারণ। প্রথম ত, আকাশে এত ধোঁয়া যে নিঃশ্বাস নিয়ে যতটা প্রাণবায়ু দরকার তা পাওয়া যায় না। দৌড়-ঝাঁপ করে এটার কতকটা প্রতীকার হতে পারে। কিন্তু শহরে মানুষ তাও করে না। কুলী মজুর পর্য্যন্ত ট্রাম-বাসে যাওয়া আসা করে।

খোরাকেরও ঢের গোলযোগ। একে ত দুধ ঘিয়ের অসম্ভব দাম। তার পর, কেনা-খাবার এত ভেজাল ও বাসি যে তাতে শরীরের ক্ষতি করবেই। শহরের জল অবশ্য খুব ভাল। কিন্তু লোকে এত বেশী কড়া তেতো চা খায়, যে তাতে হানি হবেই।

আর এক ব্যাপার দেখ, শহরে বাস করলে সভ্যতার খাতিরে জামাজোড়া পরে থাকতে হয়। অথচ জামা-জোড়া খুব পরিষ্কার না থাকলে তাতে চামড়ার ক্ষতি। তেমনি, পাকা বাড়ীতে থাকলেই যে লাভ, তা ত নয়। আসল দরকার হাওয়া ও আলো। সেটা না পাওয়া গেলে কোঠাবাড়ীতে বাস করলে কি স্বর্গলাভ হবে!

এ সব বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার। সরকার তোমাদিকে দেখবেন, কি মিউনিসিপ্যালিটী তোমাদের স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করবেন, এই ভেবে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে কেন? এখানে আর এ বিষয়ে বেশী কথা বলবার জায়গা নেই। তবে কাপড়-চোপড় ঘর-দোর যথাসাধ্য সাফ রাখবে। খাওয়া-দাওয়ার জন্য যতদূর সম্ভব খাঁটি জিনিস জোগাড় করবে। আর কিছু না পাও, চিঁড়ে মুড়ী, গুড়, কলা, এগুলোর ত মার নেই! চায়ের চেয়ে কলের খাঁটি জল ঢের বেশী উপকারী, এটাও ভুলো না। আর শেষ কথা, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যতটা সময় পার খোলা হাওয়াতে কাটিও, দৌড়ঝাঁপ কোরো। পুরোপুরি অক্সিজেন না পেলে দেহের সব গোল!

এখনকার মতন ত এই করলে! কিন্তু সকল বাপ মাকেই বলি যে ভবিষ্যতের দিকে নজর রেখে ছেলেমেয়েদের ইস্কুলে পড়তে পাঠিও। এ বিষয়ে গাফিলী কোরো না। পয়সা না থাকে ধার করেও তাদের লেখা-পড়া শিখিও। তাদের ভাল-মন্দ বিচার করবার শক্তি হলে একদিন সব দুঃখ ঘুচবে।

জড় জগৎ—গ্রহ তারা

এইবার আমি তোমাদের জড় পদার্থের কথা বলব, যে জড় পদার্থ দিয়ে জগতের সব কিছু তৈরী, মায় মানুষ পর্য্যন্ত। একবার ভেবে দেখ, জগৎ বলতে কি বোঝায়! পৃথিবীর সমস্ত পদার্থ যা তোমরা চোখে দেখছ, তারা ত আছেই। তার পর, অণুবীণ যন্ত্র দিয়ে যে সব অতি ক্ষুদ্র চেতন অচেতন জিনিস দেখা যায়, তারা আছে। আর সব শেষ আছে, এই পৃথিবীর বাহিরে চারিদিকে মহাকাশে যে সব গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু, নীহারিকা ভাসছে, তারা। এদের কতক খালী চোখে দেখা যায়, কতক দূরবীণ দিয়ে দেখা যায়, আর কতকগুলো আমরা মোটেই দেখতে পাই না। যে আকাশে এই সমস্ত পদার্থ রয়েছে তার সীমা নেই, শেষ নাই। আর বয়সেরও আদি নেই, অন্ত নেই। তাই ত এদেশের সাবেক মুনি ঋষিরা আকাশকে বলতেন—মহাকালের জটা।

যে সমস্ত নক্ষত্র আমরা খালি চোখে দেখতে পাই, তার মধ্যেই এমন অনেকগুলো আছে, যা আমাদের সূর্য্যের চেয়েও অনেকগুণ বড়। কেবল, বহুদূরে রয়েছে বলে ছোট দেখায়।
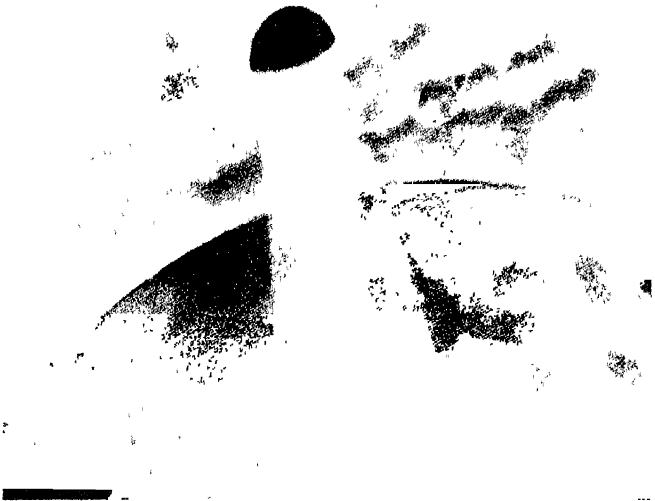
গ্রহণ

তাদের সঙ্গে আমাদের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নেই, কেন না আমরা আমাদের সূর্য্যদেবের প্রজা। তিনিই আমাদের বসুমতীকে অদৃশ্য তারে বেঁধে ঘোরাচ্ছেন, তিনিই আলো দিয়ে তাপ দিয়ে আমাদের প্রাণ বাঁচিয়ে রেখেছেন।

চন্দ্র কিন্তু এই বসুন্ধরারই সন্তান। মায়ের আঁচল ধরে চারিদিক প্রদক্ষিণ করছেন। পণ্ডিতেরা বলেন যে পৃথিবী যখন ঠিক জমাট বাঁধে নেই, তখন তারই এক টুকরো ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে চাঁদ হয়ে চারিদিকে ঘুরতে আরম্ভ করলে। তোমাদের আগেই বলেছি যে পৃথিবীর গর্ভে এখনও আগুন রয়েছে, ভেতরটা আজও জমে নেই। সুতরাং এ কথা সহজেই ধারণা করতে পারবে, যে একদিন এই খোলটাও নরম পাঁকের মতন পদার্থ ছিল। নরম কাদার গোলা একটা জোরে ঘুর-পাক খেলে তার এক খণ্ড ছিটকে বেরিয়ে যাওয়া কি আশ্চর্য্য?

সূর্য্য (রবি) হল, চাঁদ (সোম) হল, এখন বাকী পাঁচটা প্রধান গ্রহেরও নাম জেনে রাখ। সহজেই মনে থাকবে, কেন না এই সাত স্যাঙ্গাতের নামেই হপ্তার সাত বারের নাম রাখা হয়েছে। এই পাঁচ গ্রহের নাম তাহলে মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি। এরাও পৃথিবীর মত সূর্য্যের চারিদিকে বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে। পৃথিবীর জন্ম যেমন পিতা সূর্য্যদেবের অঙ্গ হতে, এদেরও তাই।

এখন একটা কথা তোমাদের মনে রাখতে বলি। সূর্য্যের অঙ্গ থেকে গ্রহেরা বেরিয়ে এল। গ্রহের অঙ্গ থেকে চাঁদের মতন উপগ্রহেরা বেরিয়ে এল। কিন্তু এরা ছিটকে দূরে পালিয়ে

গেল না কেন? তুমি হাতে একটা ঢিল নিয়ে ঘুর-পাক খেতে খেতে তোমার হাত থেকে ঢিলটা যদি ফসকে যায়, ত সে কত দূরে গিয়ে পড়বে! কিন্তু সেই ঢিলটাই যদি আবার একটা সুতো দিয়ে বাঁধা থাকে ত যাবে কোথায়! হাত থেকে খসে পড়লে তোমার চারিদিকে বোঁ-বোঁ করে ঘুরবে, যতক্ষণ তার জোর থাকে। আমাদের গ্রহ উপগ্রহেরও সেই ব্যাপার। তারা অদৃশ্য তার দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা।

এই যে বাঁধন, এটা কি? পৃথিবীর উপর থেকে ত কোন জিনিসই উড়ে পালিয়ে যেতে পারে না। তা ত তোমারা জান! একটা খেলবার বল্ নিয়ে যত জোরেই উপর পানে ছোঁড়, জোর ফুরিয়ে গেলে নীচে পড়বেই। খুব ভাল বন্দুক নিয়ে চাঁদের দিকে গুলি মার, খানিক পরে গুলিটা টুপ করে এসে ভুঁয়ে পড়বেই। আকাশে পাখী ওড়ে, উড়ো জাহাজ ওড়ে, কিন্তু কত ক্ষণ? যত ক্ষণ জোরে ডানা ঝাপটায় কি ইঞ্জিন চলে, তত ক্ষণ। শেষ, পৃথিবীর কোলে এসে পড়তেই হবে।

শুধু পৃথিবীই যে টানে, তা নয়। সব পদার্থই সব পদার্থকে টানছে। তবে পৃথিবীর টান এত বেশী যে তার বুকের উপর একটা জিনিস আর একটাকে টেনে হেঁচড়ে কাছে নিয়ে যেতে পারে না। কিন্তু চাঁদ যে টানে তার প্রমাণ ত জোয়ার ভাটা! শুধু জোয়ার ভাটা কেন, তোমার বৈদ্য কি হকীমকে জিজ্ঞাসা কোরো, তিনি বলবেন যে পূর্ণিমা অমাবস্যায় চাঁদ শরীরের রসকেও এমন টানে যে ঐ দিনে জ্বর ছাড়ে না, বাতের ব্যথা বাড়ে।

জড় জগৎ—গ্রহ তারা

যেমন পৃথিবীর টান আছে বলে তার সীমার ভেতর সব টেনে হেঁচড়ে একাকার হয়ে যায় না, তেমনি সূর্য্যের মতন একটা প্রবল মালিকের হাতে রাশ রয়েছে বলে গ্রহ উপগ্রহেরা ছত্রাকার হয়ে যায় না।

তোমাদের সব গ্রহের নাম বললাম না, আর চাঁদ ছাড়া কোন উপগ্রহেরও নাম করলাম না, বেশী নাম মনে রাখতে পারবে না বলে। কিন্তু জেনে রাখ, যে আমাদের সূর্য্যমণ্ডলের ভেতরে বাহিরে আরও অনেক জড়পিণ্ড ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা কেউ ছোট, কেউ বড়। কোথাও বা জড়কণাগুলো আজও জমাটই বাঁধে নেই।

এখন এই পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে দুই একটা কথা তোমাদিকে পরিষ্কার করে বলব। পৃথিবীটা কমলা লেবুর মত গোল। সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরছে। ঘুরছে মানে ঘোড়া যে রকম করে বাগানটা চক্কর দিয়ে আসে, সে রকম নয়। প্রথম লাট্টুর মতন ঘুরপাক খাচ্ছে, তারপর ঘুরে ঘুরে লাট্টু যে রকম চলে, সেই চালে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করছে। একবার ঘুরপাক খেতে লাগে চব্বিশ ঘণ্টা, অর্থাৎ দিনরাত। আর একবার সূর্য্যকে চক্কর দিতে লাগে এক বছর। একটু তেড়চা হয়ে ঘুরছে, তাই উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন হয়। অর্থাৎ সূর্য্য কখনও উত্তরে হেলেন, কখন দক্ষিণে। লাট্টুর ভেতর দিয়ে একটা লোহার পেরেক চলে যায় ত! তারই চারিদিকে লাট্টুটা ঘোরে। পৃথিবীর ভেতর সে রকম পেরেক ত আর নেই, তবে সেই রকম একটা রেখা আছে। সেই রেখার দু মুখে উত্তর-মেরু আর দক্ষিণ-মেরু। পরে যখন চুম্বকের কথা

তোমাদের বলব, তখন আর একবার এই মেরুর নাম করব। এখন মজা হচ্ছে এই, যে এই দুই মেরুতে আমাদের দেশের মতন আট পহর অন্তর সূর্য্য ওঠে না। পৃথিবী একটু কাৎ খেয়ে চক্কর দিচ্ছে কি না, তাই এক এক মেরু ছ মাস রোদ পায়। যখন উত্তর মেরু রোদ পাচ্ছে তখন দক্ষিণ মেরুতে অন্ধকার। আবার যখন দক্ষিণ মেরুতে ঠায় ছ মাস রোদ আসছে তখন উত্তর মেরুতে অন্ধকার। আমাদের পুরাণে এক কথা আছে যে দেবতাদের দিন রাতে আমাদের এক বছর হয়। কে জানে, হয় ত এই মেরুর কথা ভেবেই মুনি ঋষিরা সে কথা বলে গেছেন!

চাঁদ বেচারার নিজের আলো নেই। সূর্য্যের আলো কখন কতটা পায় তার উপর নির্ভর করছে তার চেহারা, তার তিথি। চাঁদ তিরিশ দিনে, বা দুই পক্ষে, পৃথিবী একবার প্রদক্ষিণ করে।

সূর্য্য-গ্রহণ, চন্দ্র-গ্রহণ, তোমরা সবাই জান। এই গ্রহণ ছায়া বই আর কিছু না। একটা আলোর সামনে নিজের দুটো হাত মুঠো করে ঘুরিয়ে দেখো, কত রকম আলো ছায়া পড়বে। সূর্য্যই হচ্ছে আমদের মণ্ডলের একমাত্র প্রদীপ। এর চারিদিকে পৃথিবী চাঁদকে নিয়ে ঘুরছে। আবার চাঁদও সব সময়টা পৃথিবীকে চক্কর খাচ্ছে। এই সব ঘুরপাকের দরুণ কত রকম আলো আঁধারের খেলা চলেছে। গ্রহণ তারই ফল। এর বেশী আর বোঝাতে চেষ্টা করব না। তবে মনে রেখ যে চন্দ্রগ্রহণ পূর্ণিমা ছাড়া অন্য তিথিতে আর হয় না, আর সূর্য্য গ্রহণ অমাবস্যা ছাড়া হয় না।

চাঁদের উপরের মরা আগ্নেয়-পর্ব্বত

রাহু বলে এক রাক্ষস চাঁদ সূর্য্যকে গেলে, তাই গ্রহণ হয় ; এ নিতান্ত ছেলে-ভুলানো গল্প কথা। আমাদের সেকালের পণ্ডিতরা গ্রহণের সত্যি কারণ জানতেন। তাঁরা ছায়া পড়ে গ্রহণ হওয়ার কথা জ্যোতিষের বইতে স্পষ্টই লিখে গেছেন।

এইবার আর এক কথা বলি। তোমাদের হয় ত জানতে ইচ্ছা হবে কথাটা। আকাশের এই গ্রহ-নক্ষত্র, এরা কি আমাদের পৃথিবীর মতন জল-স্থল, পাহাড়-পর্ব্বত, গাছ-পালা, জন্তু-জানোয়ারে ভরা? মানুষ কি আর কোথাও আছে? এ সব বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া বড় কঠিন ব্যাপার। আমাদের একমাত্র দূত ত দূরবীণ! সূর্য্য-মণ্ডলের বাহিরে যে বড় বড় নক্ষত্র আছে, তারা এত দূরে রয়েছে যে খুব বড় বড় জোরালো দূরবীণ দিয়েও তাদের চেহারা বোঝা যায় না। আমাদের গ্রহ উপগ্রহের মধ্যে যদি কোথাও গাছ-পালা, জীব-জন্তু থাকে, ত সে এক মঙ্গল গ্রহে। তবে এরও প্রমাণ নেই। যে কারণে কেউ কেউ এ কথা বলেন তা তোমাদের বুঝিয়ে দিই।

সূর্য্যের কথা ছেড়ে দাও, কেন না তার দেহে কোথাও এতটুকু কঠিন কি জলীয় পদার্থ নেই। লোহা তামার মতন ধাতু পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থ সেই ভীষণ তাপে গলে বাষ্প (ভাপ) হয়ে রয়েছে। তেমনি চন্দ্রও অসম্ভব জায়গা, কিন্তু অন্য কারণে। চাঁদ একেবারে মরা ছাইয়ে ঢাকা। সেখানে না আছে এক ফোঁটা জল, না আছে তার আকাশে এক বিন্দু অক্সিজেন। উদ্ভিদ কি জীবজন্তু চাঁদের উপর এক মুহূর্ত্ত বেঁচে থাকতে পারে না। আবার দেখ, এই উপগ্রহ ত খুব বেশী দূরে নয় আমাদের

কাছ থেকে, দূরবীণ দিয়ে এর অনেক ছবি তোলা হয়েছে। সে ছবিতে কেবল গাদা গাদা মরা জ্বালামুখী পাহাড়ের মুখ দেখতে পাওয়া যায়। কোন রকম প্রাণীর কিছুমাত্র চিহ্ন দেখা যায় না। বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, এরা কেউ সূর্য্যের কাছে বলে অসম্ভব গরম, কেউ বহু বহু দূরে বলে অসম্ভব ঠাণ্ডা। এদের কারও আকাশে অক্সিজেনের চিহ্ন পাওয়া যায় নেই। বাকী রইল মঙ্গল। এ গ্রহটাও পৃথিবীর চেয়ে ঠাণ্ডা, তবে প্রাণীর পক্ষে অসম্ভব ঠাণ্ডা নয়। দূরবীণে এর ছবি দেখে এইটে স্থির হয়েছে যে বছরের মধ্যে ছ-মাস এর উত্তর মেরু সাদা দেখায়, আর বাকী ছ-মাস কালো কালো দেখায়। এর থেকে আন্দাজ হয় যে ওখানে ছুটো ঋতু আছে। শীতকালে উত্তর মেরু বরফে ঢাকা থাকে, আর গ্রীষ্মকালে সেই বরফ গলে যায়। মঙ্গলের গায়ের মাঝখানটায় কতকগুলো কালো কালো জায়গা আছে। উত্তর মেরুর বরফ গেলে গলে এ জায়গা গুলোর রঙ বদলে যায়। এরা কখন দেখায় নীল-সবুজ, কখন দেখায় পাটকিলে। এর থেকে আন্দাজ এই হয়, যে মাঝখানের কালো জায়গাগুলো গাছ-পালা, মেরুর বরফ গললে সেই জল পেয়ে তার নূতন পাতা ডাল পালা গজিয়ে ওঠে, রঙটা বদলে যায়। আরও এক কথা আছে। দূরবীণের ছবিতে মঙ্গলের গায়ে কতকগুলো লম্বা লম্বা সোজা রেখা দেখা যায়। সে গুলো নদী হতে পারে না, কারণ নদী একেবারে সোজা কখন যায় না, এঁকে বেঁকে চলে। এর থেকে কেউ কেউ কল্পনা করেছেন যে এগুলো কাটা খাল, মঙ্গলের বাসিন্দারা চাষ-বাসের সুবিধার জন্ত কেটেছে। এ যদি সত্য হয়,
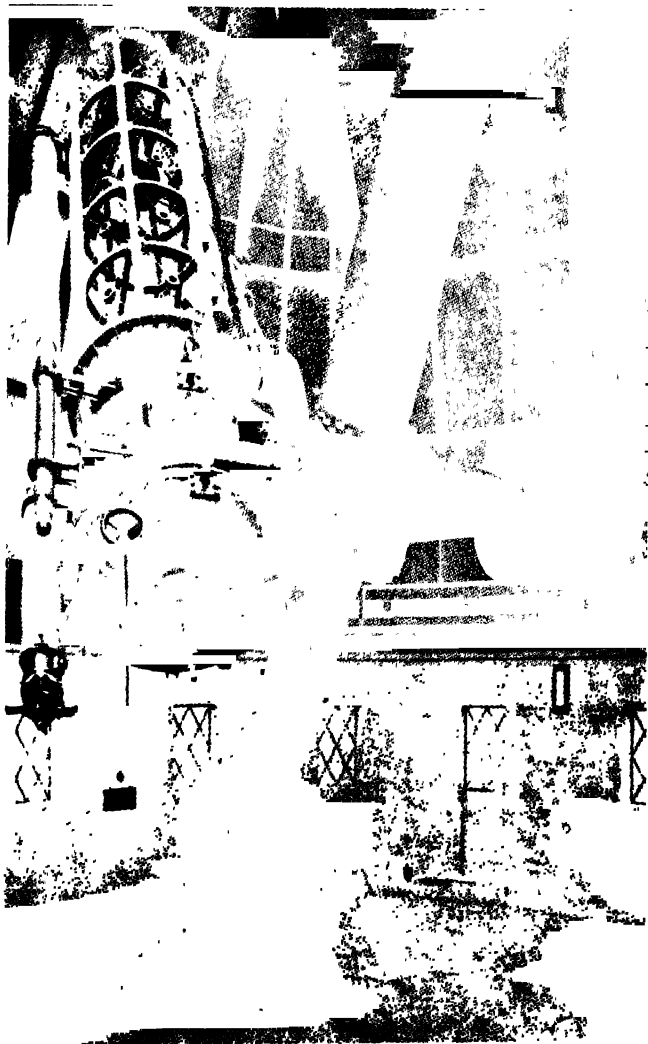
গ্রহ-নক্ষত্র দেখার বড় দূরবীন

ত মঙ্গলে শুধু গাছ-পালা আছে তা নয়, বুদ্ধিমান্ জীবও আছে। এ কথাগুলোকে নিতান্ত গাঁজাখুরী বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে যা বললাম, তাকে ঠিক প্রমাণ বলেও গ্রাহ্য করা যায় না। সবুর করা ছাড়া উপায় নেই। যন্ত্রপাতি আরও ভাল হোক, একদিন ঠিক খবর পাওয়া যাবে মঙ্গলের বাবুদের।

উপরে যা বলে এলাম, তার থেকে তোমরা এটা বুঝছ ত, যে অনন্ত আকাশের অতি সামান্য একটা অংশে সূর্য্যদেব তাঁর নাতি-পুতি নিয়ে ঘর করছেন, আর বাকী স্থানটায় যে কোটি কোটি তারা আছে তাদের সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি না। তার ভেতরে আমাদের সূর্য্য-মণ্ডলের মতন হয় ত অনেক মণ্ডল আছে। মানুষে ভরা, কি দেবতায় ভরা, কি দানবে ভরা পৃথিবীর মতন গ্রহও হয় ত কতই আছে। কত যে নূতন গ্রহ গড়ছে, কত যে ভাঙ্গছে প্রতিদিন তারও গুনতি নেই।

এই যে ভাঙ্গা গড়া চলেছে, এর একটু আধটু খবর আমরা পাই ধূমকেতুর কাছ থেকে। ধূমকেতু তোমরা কেউ কেউ নিশ্চয় দেখেছ। অনেক বছর পরে পরে আমাদের আকাশে দিন কয়েকের জন্য একটা প্রকাণ্ড রূপোর ঝাঁটার মতন জিনিস এসে উদয় হয়, আবার বেরিয়ে যায় তার নির্দ্দিষ্ট পথে আকাশে ঘুরতে। এরই নাম ধূমকেতু। এর মাথায় একটা তারা, আর ল্যাজে অসংখ্য জড় পদার্থের টুকরো। সময় সময় আমাদের কাছ দিয়ে যেতে যেতে আমাদের ল্যাজের ঝাপটা মেরে যায়। তখন দিন কয়েক আমাদের পৃথিবীতে খুব উল্কাবৃষ্টি হয়। পাথরের ও ধাতুর টুকরো যেগুলো পৃথিবীর কোটে আসে, সেগুলোকে

পৃথিবী জোর করে নিজের অঙ্গে টেনে নেয়। আমাদের বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে পড়তে পড়তে টুকরোগুলো হাওয়ায় ঘসা লেগে জ্বলে ওঠে। তখন আমরা এদিকে বলি উল্কা বা খসা তারা। এই উল্কা পিণ্ড সচরাচর খুব ছোটই হয়, আমড়ার মতন। কিন্তু সময় সময় এক আধটা খুব বড় চাঙ্গড়ের কথা শোনা যায়। মার্কিণ দেশে এক জায়গায় পাহাড়ে বিশাল গর্ত্ত আছে। লোকে বলে সেই গর্ত্ত এক প্রকাণ্ড উল্কা পড়ে হয়েছিল। সাইবেরিয়ার দেশে একবার পাহাড়ের মতন মস্ত একটা উল্কা পড়ে ক্রোশ তিন চার জঙ্গল চযে ফেলেছিল। কলকাতার যাদুঘরে নানা রকম খসা-তারার নমুনা রাখা আছে, সুবিধা পেলে দেখে এসো। একটা মজার নমুনা আমি একবার দেখেছিলাম, মনে আছে। এক মুঠো খুব ভাল ইস্পাতের মটরের মতন, ভেতরটা ফাপা। দেখে গল্প মনে পড়ে গেল যে, খসা-তারা গোবরে পড়লে তা দিয়ে খুব উৎকৃষ্ট সিঁধকাঠি গড়া যায়।

একটু আগে যে বায়ুমণ্ডলের নাম করেছি সেটা কি, বুঝিয়ে দিই। পৃথিবীর চারিদিকে পঁচিশ ক্রোশ পর্য্যন্ত আকাশটা ঠিক ফাঁকা জায়গা নয়। ও জায়গাটা প্রধানতঃ দু রকম অদৃশ্য ধোঁয়াটে পদার্থে ভরা। এই দুই ধোঁয়ার নাম অক্সিজেন আর নাইট্রজেন। অক্সিজেন বা প্রাণবায়ু ত তোমাদের চেনা জিনিস! প্রাণীরা সেই বায়ু টেনে নিয়ে শরীর রক্ষা করছে। নাইট্রজেন করছে কি? সত্যি বিশেষ কিছু করছে না। নাইট্রজেন টেনে কেউ প্রাণী কি উদ্ভিদ বাঁচবে না। তবে কি জান, খাঁটি অক্সিজেন ভীষণ তেজী জিনিস। সে জিনিস সুস্থ অবস্থায় নাকে নিলে

উৎসাহ

ভেতরটা জ্বলে পুড়ে যায়। তাই প্রকৃতি দেবী খানিকটে নাইট্রজেন মিশিয়ে সেটাকে আমাদের ব্যবহারের যোগ্য করে রেখেছেন। বায়ু মণ্ডলে এই দুই গ্যাস ছাড়া অল্পবিস্তর জলের ভাপ ও কয়লার ধোঁয়াও আছে। কয়লার ধোঁয়ার কাজের কথা আগে বলেছি। গাছপালা এর থেকে কয়লাটা ক্রমাগত টেনে টেনে নিচ্ছে। জলের ভাপ দিবারাত্র সমুদ্র থেকে, নদী থেকে পুকুর থেকে আকাশে উঠছে। আবার আকাশ তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে শিশির, বৃষ্টি, শিল ও তুষার রূপে। আকাশের যে জল তাকেই ত পুরাণে মন্দাকিনী,আকাশ গঙ্গা এই সব নাম দিয়েছে। মহাদেব সেই জল জটায় ধরে পৃথিবীতে আবার নদীরূপে পাঠিয়ে দিয়েছেন। পৃথিবীর যে আকর্ষণী বা টানবার শক্তি আছে, সে কথা তোমাদের বলেছি। এই শক্তির জোরেই ত পৃথিবী এই পঁচিশ ক্রোশ পুরু কোটটাকে গায়ে আটকে রেখেছে!

গ্রহ-তারার কথা আমার শেষ হল। অনন্ত আকাশ! তার আদি নেই, লয় নেই। তার মাঝে ভাসছে ছোট বড় অসংখ্য জড়পিণ্ড। তারই একটা আমাদের জননী বসুমতী। এমন দিন ছিল, যখন এই বসুমতী ছিল না। হয়ত এমন দিনও ছিল, যখন একটাও গ্রহ নক্ষত্র এই অসীম আকাশে ছিল না তখন জড়কণা ছিল কি? কে বলতে পারে! তবে এটা নিশ্চিত যে প্রাণ শক্তি ছিল, যে শক্তির কম্পনে, স্পন্দনে, সংঘাতে সমস্ত জড় পদার্থ গড়ে উঠেছে।

জড় পদার্থ

পদার্থের এক রকম শ্রেণী-বিভাগ আমাদের সেকালের লোকে করেছিলেন, তার কথা আগেই বলেছি—মাটি, জল, ও বায়ু—অর্থাৎ কঠিন, তরল ও ধোঁয়াটে পদার্থ। এ কিন্তু যথার্থ শ্রেণী-বিভাগ হল না। কেন না, এ কেবল অবস্থা-ভেদের ব্যাপার। জল বলে যে জিনিসটা, তাকেই ঠাণ্ডা করলে হল বরফ, গরম করলে হল ভাপ। পারদ বা পারা বলে এক ধাতু আছে জান? জ্বর-কাঠির ভেতরে যে চকচকে পদার্থ দেখা যায়, যেটা চড়ে নামে, সেইটেই পারা। এই পারাকে আমরা সচরাচর দেখি তরল বা জলীয় রূপে। কিন্তু একে ঠাণ্ডা করলে জমে যায়, গরম করলে ফুটে ভাপ হয়ে যায়। রাঙ্গতা, শীষে, সহজেই গলে। মোম খুব অল্প তাপে গলে। নারিকেল তেল একটু ঠাণ্ডাতেই জমে যায়। লোহা, তামা গলতে বেশী তাপ দারকার। তবু তোমরা নিশ্চয় জান যে লোহা তামা ঢালাই করে কত জিনিস তৈরী হয়।

অক্সিজেন, নাইট্রজেন, কয়লার ধোঁয়া, এদিকে আমরা প্রকৃতিতে পাই গ্যাসরূপে। কিন্তু খুব চাপ লাগিয়ে ঠাণ্ডা

করলে এরাও প্রথমে তরল, তার পর কঠিন পদার্থ হয়ে জমে যায়।

তা হলে বুঝতে পারলে ত, যে একই পদার্থ অবস্থা-ভেদে কঠিন, তরল বা গ্যাস হয়ে থাকে! কিন্তু যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, পদার্থ মাত্রেরই একটা ওজন আছে। কঠিন বা তরল পদার্থ সম্বন্ধে এটা ত সহজেই ধারণা হয়। হাতে করে তুলে ধরার মামলা বই ত নয়! তা হলেই বোঝা যায়। কিন্তু গ্যাসের ওজন ত হাতে হাতে ধরা যায় না। সেটা একটু ভেবে দেখবার কথা।

একটা পরীক্ষা করতে পার। কোন লোহার জিনিস সাবধানে ওজন করে বাহিরে রোদে জলে ফেলে রেখে দাও। এক বছর পরে দেখতে পাবে তার সর্ব্বাঙ্গে মরচে পড়েছে। তখন তাকে আবার ওজন কর। দেখবে ওজনটা স্পষ্ট বেড়ে গেছে। কি করে বাড়ল! অক্সিজেন খেয়ে তবে ত মরচে ধরেছে! যতটা বেশী ওজন হয়েছে, সেইটে হল মরচের ভেতরের অক্সিজেনের ভার। এ ত সোজা কথা!

আর একটা পরীক্ষা। খানিকটে পরিষ্কার চুনের জল নিয়ে, একটা নলের ভেতর দিয়ে তার মধ্যে ফুঁ দিতে থাক। জলটা প্রথমে ঘোলাটে হয়ে যাবে, তার পর একটা সাদা গুঁড়ো তলায় থিতিয়ে পড়বে। এই সাদা পদার্থটা হল চা-খড়ি, চুনের জল আর তোমার মুখের ধোঁয়া মিলে তৈরী হয়েছে। চুনের জলটা ফুঁ দেবার আগে আর পরে ওজন করলেই দেখতে পাবে, ওজন বেশ বেড়েছে। যতটা বেড়েছে, সেইটে তোমার মুখের থেকে বেরোন গ্যাসের ভার।

এই রকম নানা সহজ পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে গ্যাস পদার্থেরও ওজন আছে। তা হলে স্থির হল ত, যে সব পদার্থেরই ওজন আছে? আচ্ছা, এই ওজন জিনিসটা কি? মনে আছে আগে বলেছি, পৃথিবী সব পদার্থকে টানছে! কোন পদার্থকে কত জোরে টানছে, এই ওজন হচ্ছে তারই মাপ। মোটা ভারী লোকে বেশী লাফাতে পারে না কেন? পৃথিবী তাকে বেশী জোরে টানছে বলে। সেই টানটা কাটিয়ে লাফ মারতে বেশী তাকৎ দরকার। সে তাকৎ তার নেই, কেন না পেট মোটা হলেই ত আর জোর বেশী হয় না! মানুষের হাতে ডানা বেঁধে দিলেও সে উড়তে পারে না কেন, আর পাখী সহজেই ওড়ে কেন? কারণ, ওজনের তুলনায় দেহের বল মানুষের চেয়ে পাখীর ঢের বেশী। মানুষের ওজন ধর, গড়-পরতা দেড় মণ। দেড় মণ ভার ডানার ঝাপটে তুলে নিয়ে যাবার মতন মস্‌লের জোর তার নেই। উড়তে গেলে পৃথিবী তাকে পেড়ে ফেলবেই।

এই যে আমাদের মাথার উপর পঁচিশ ক্রোশ পুরু বায়ুমণ্ডল রয়েছে, এর একটা ওজন নিশ্চয়ই আছে। তোমরা বলবে, কই ভার ত কিছু বুঝতে পারি না! কিন্তু এই ভার ঘাড়ে করে রয়েছ জন্মাবধি, বুঝতে পারবে কি করে! মাছ যখন জলের তলায় সাঁতরে যায়, সে কি তার মাথার উপরকার ভার বুঝতে পারে? কিন্তু তুমি গভীর জলে ডুব দিলেই তোমার বুকের উপর, গলার উপর, বেশ একটা চাপ বোধ করবে। আচ্ছা, এই পঁচিশ ক্রোশ হাওয়ার ওজন যদি হঠাৎ সরিয়ে নেওয়া যায়, ত তোমার দেহের কি হবে, জান? শরীর ফুলে উঠবে, চামড়া

ফেটে যাবে, রক্তারক্তি কাণ্ড হবে। তোমার হাতের উপরটা চুষে দেখ, কি হয়। চুষলে ত সেইখানকার হাওয়াটা সরিয়ে নেওয়া হল! একটু চুষলেই দেখবে, চামড়া ফুলে লাল হয়ে যাবে। আর একটু চুষলেই ফেটে রক্ত বেরোবে।

হাওয়ার ওজন বা চাপ মাপবার এক যন্ত্র আছে। নাম বেরমিটার। এই ওজন মাপবার দরকার কি, জান? বায়ুতে জলের ভাপ আছে, আগেই বলেছি। এই জলের ভাপ পদার্থটা হালকা! তাই, এটা বেশী থাকলে হাওয়ার চাপ কমবে, আর কমে গেলে হাওয়ার চাপ বাড়বে। এ কথা বুঝতে পারছ ত? এখন, বাদলা হলে, ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলে, হাওয়াতে জলের ভাপ বেড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ার চাপও কমে যায়। বেরমিটারে এইটে ধরা পড়ে। কল-কারখানার, কি জাহাজের কর্ত্তারা আগের থেকে সাবধান হতে পারেন। এ কি কম সুবিধা!

এখন, এ যন্ত্রটা কি, তা মোটামুটি বুঝে নাও। এক দিক বন্ধ লম্বা একটা কাচের নল পারা দিয়ে ভরে ফেল। তার পর তাকে উল্টে দাও আস্তে আস্তে এক গামলা পারার ভেতর। অবশ্য উল্টোবার সময়ে আঙুল দিয়ে ছেঁদাটা বন্ধ করে উল্টোতে হবে। উল্টে দিয়ে আঙুলটা সরিয়ে নিলে দেখবে যে, খানিকটা পারা নেমে গেছে, কিন্তু কম-বেশী উনত্রিশ ইঞ্চি পারা নলের ভেতর দাঁড়িয়ে রয়েছে। বল দেখি, এই উনত্রিশ ইঞ্চি পারা কিসের জোরে খাড়া রইল? সোজা জবাব। গামলার পারার উপর যে পঁচিশ ক্রোশ হাওয়ার চাপ পড়েছে, সেই চাপই ঐ নলের

পারাকে তুলে ধরে রয়েছে। তা হলে, হিসেব করলেই পাবে যে, পারার ভার হাওয়ার ভারের কত গুণ।

বায়ুমণ্ডলের চাপ যে খালী পারাকেই তুলে ধরে থাকতে পারে, তা নয়। তেল, জল, ইস্পিরিট, যা দেবে তাকেই তুলে ধরবে। জল পারার চেয়ে অনেক হালকা, তাই প্রায় তিরিশ ফুট জল হাওয়ার চাপে দাঁড়িয়ে থাকবে। কিন্তু তার চেয়ে বেশী দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। তাই সোজা দমকল, যাকে ইংরেজীতে বলে পম্প, তিরিশ ফুটের চেয়ে বেশী গভীর কুয়ো থেকে জল তুলতে পারে না। পম্প ত আমাদের দোল খেলার পিচকারীর মতনই চলে। ডাঁটিটা টানলেই চোঙার ভেতর খালী হয়ে গেল। খালী মানে একেবারে শূন্য। তার ভেতর না আছে অক্সিজেন না আছে নাইট্রজেন, না আছে অন্য কিছু। যেই খালী হল, কি বাহিরের জলের উপর যে হাওয়ার চাপ পড়ছে সেইটা জলকে ঠেলে তুলে দেবে চোঙাতে।

কিন্তু একটা মজা দেখ, যদি ডাঁটির দিকে একটুকু ফাঁক রয়, ত জল চড়বে না। কেন না, তা হলে ত আর তোমার চোঙা খালী হবে না। ডাঁটির দিক থেকে হাওয়া ঢুকবে। এই জন্যই ত পিচকারী তৈরী করার সময়ে ডাঁটিতে খুব সাবধানে ন্যাকড়া জড়াতে হয়।

বায়ুমণ্ডলের চাপ দেখাবার আর একটা খুব সহজ উপায় আছে। সবাই ঘরে করে দেখতে পার। একটা গেলাস কানায় কানায় জলে ভর্ত্তি কর। তার পর এক টুকরো পুরু কাগজকে একেবারে জলে ডুবিয়ে নিয়ে গেলাসের উপর ঢেকে দাও। খুব
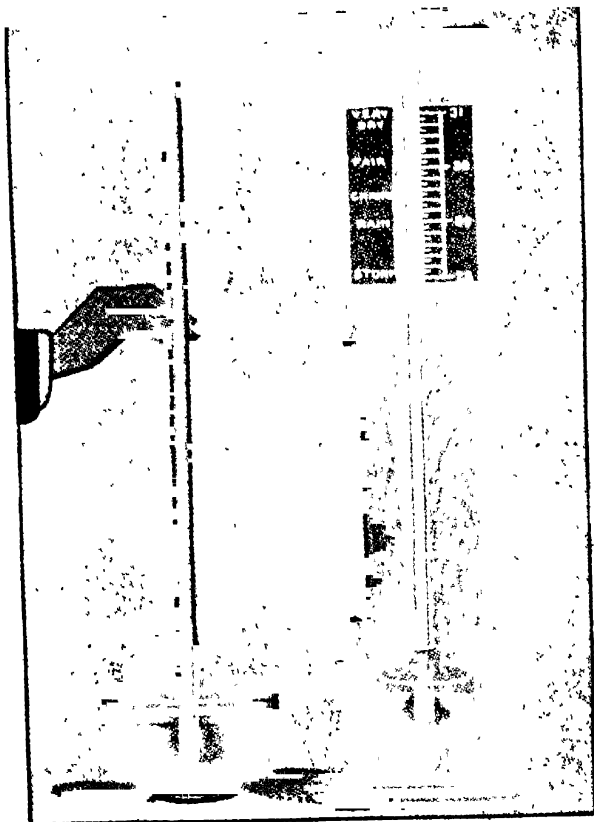
বেরমিটার

সাবধানে ঢাকতে হবে, যেন ফাঁক না হয়, যেন ভেতরে হাওয়ার একটাও বুড়বুড়ী না থাকে। তার পরে কাগজটা এক হাতে চেপে ধরে গেলাসটা ধাঁ করে উল্টে দাও। এইবার আস্তে আস্তে হাত সরিয়ে নাও, দেখবে যে কাগজটা পড়বে না। যেমনকার তেমনি আটকে থাকবে হাওয়ার চাপে। এ পরীক্ষা অতি সহজ। কিন্তু কোন রকমে একটু হাওয়া গেলাসের ভেতর গেলেই সব ফেঁসে যাবে।

আর একটা পরীক্ষা করে দেখতে পার। 'U' এই গড়নের একটা নল চাই। নলের যে মুখে ইচ্ছা জল ঢাল, দেখবে যে দুই দিকে জল ঠিক সমান উঠবে। যখন জল উপচে পড়বে, দুই মুখেই এক সঙ্গে উপচাবে। যদি সাধারণ সরু ফাঁদলের কাচের নল হয়, ত তাইতে পুরোপুরি জল ভরে, একটা মুখ আঙুল দিয়ে বন্ধ করে উল্টে ধর। দেখবে যে, অন্য মুখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাবে না। বায়ুমণ্ডলের চাপ তাকে আটকে ধরে থাকবে।

একটা 'U' নল এই রকম আঙুল দিয়ে বন্ধ করে, উল্টে ধরে, বন্ধ দিকটা এক গামলা জলে ডুবিয়ে ছেড়ে দাও। দেখবে যে গামলার জলটা সব হুড় হুড় করে নল দিয়ে বেরিয়ে যাবে। একেই ইংরাজীতে বলে সাইফন্।

কেন এ সব হয়? নিজে নিজে একটু ভেবে দেখো, বুঝতে পারবে। এ সবই ঐ হাওয়ার চাপের খেলা।

এই পরীক্ষাটা একটু রকমারি করে দেখতে পার। নলের বদলে একটা ন্যাকড়ার ফালি জলে ভিজিয়ে এক গেলাস জলে

তার একটা দিক তলা পর্য্যন্ত ডুবিয়ে ছেড়ে দাও। অন্য দিকটা গেলাসের বাহিরে ঝুলুক। দেখবে যে, আস্তে আস্তে গেলাসের জলটা সব কালি বেয়ে বেরিয়ে যাবে।

এই বুদ্ধি করে নল দিয়ে কি ন্যাতা দিয়ে সাইফন করে কত সময়ে বড় বড় চৌবাচ্চা, লোহার ট্যাঁকি খালী করা হয়। দমকল লাগাবার খরচ ও পরিশ্রম বেঁচে যায়।

বায়ুমণ্ডলের চাপের কথা তোমাদিকে বোঝান হল। এইবার জড়পদার্থ সম্বন্ধে অন্য কথা বলি।

তাপ

তাপের কথা কিছু বলবার আগে কঠিন, তরল ও ধোঁয়াটে পদার্থের গুণ সম্বন্ধে আর একটু আলোচনা করতে হবে। এ তিনটের তফাৎ ত তোমরা জান! আগেই জলের দৃষ্টান্ত দিয়ে তোমাদের বলেছি যে, জলকে গরম করে বাষ্প করা যায়, আবার ঠাণ্ডা করে বরফ করা যায়। এই যে পদার্থের তিন রকম অবস্থা-ভেদ, এর সঙ্গে তাপের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

আচ্ছা, কঠিন পদার্থ বললেই কি বুঝবে? লোহা, সোনা, ইট, বালি, এ সব কঠিন পদার্থ। খুব নরম পালকও কঠিন পদার্থ। সুতরাং এ বললে চলবে না যে, কঠিন পদার্থ মানে সেই জিনিস, যা ছুঁড়ে মারলে মাথা ফেটে যায়। কিন্তু এ সব জিনিস-গুলোর একটা গুণ আছে, যা জলেরও নেই, হাওয়ারও নেই। এদের সবাইকার একটা নিজস্ব গড়ন আছে। তোমরা হয় ত বলবে, বালির আবার গড়ন কি, এক রাশ বালি কখন চূড়ো হয়ে থাকে, কখন গোল, কখন চার-কোণা! আমি তা হলে বলব, এক রাশ ইট পাথরেরও ত সেই অবস্থা, তাই বলে কি ইটকে বে-ঢপ বলতে পার? বালির দানা ইটের চেয়ে ছোট

এই যা, নইলে একটু নজর করে দেখলেই বুঝতে পারবে যে, তারও একটা গড়ন আছে! ভাতে বালি থাকলে, তোমার দাঁতই বলে দেবে যে, বালি কত শক্ত জিনিস।

তরল পদার্থের নিজের গড়ন নেই। যখন যে পাত্রে থাকে তারই গড়ন নেয়। ঢল-ঢলে জিনিস, ঝোলাবারও যো নেই, দাঁড় করাবারও যো নেই। তবু তরল পদার্থের একটা মাপ-জোখ আছে। একটা কলসীতে, কলসী-ভরা জলও রাখতে পার, আধ কলসীও পার, পোয়া কলসীও পার।

ধোঁয়া কি গ্যাসের বেলা ভারী গোলযোগ! জলের মতন এরও গড়ন নেই বটে। কিন্তু মাপ-জোখও নেই। গ্যাসের ঢল-ঢলে ভাবটা এত বেশী, যে ছাড়া পেলেই ফেঁপে ফুলে উঠবে। এক শিশি জল বললে মানে হয়, কিন্তু এক শিশি এমোনিয়া গ্যাস বললে কোন অর্থ ই হয় না। কেন না, সেইটুকু এমোনিয়া কলসীতে ঢাললে কলসী ভরে যাবে, কলসীর মুখ খুলে রাখলে আস্তে আস্তে ঘর ভরে যাবে।

এমোনিয়ার যখন নাম করে ফেললাম, তখন সে পদার্থটা কি, তা বলি। একটু নিশাদল বেনের দোকান থেকে সংগ্রহ করে হাতের চেটোতে চুনের সঙ্গে ঘষলে একটা খুব চড়া গন্ধ ধোঁয়া বার হবে, সেইটা এমোনিয়া। এ জিনিস অনেক কাজে লাগে মানুষের। তোমাদের মাথা ধরলে একটু শুঁকে দেখো, খুব আরাম পাবে।

কঠিন পদার্থ কত রকমের হয়, তা তোমরা নিশ্চয় খেয়াল করেছ। কোন জিনিস কাচ চীনেমাটির মতন ঠুনকো, পড়লেই

কি হাতুড়ী মারলেই চুরমার হয়ে যায়। কোন জিনিস বা রবারের মতন, টানলে বাড়ে। দস্তা ধাতুটা এমন দানা-বাঁধা যে ঠুকলে ভেঙ্গে যায়, কিন্তু সোনাটাকে পিটে পিটে কত সরু পাত কি তার করতে পার! কোন পদার্থ হীরের মতন শক্ত, কেউ বা মোমের মতন নরম, কেউ বা মাঝামাঝি। তার পর দেখ, কেউ বা কাচ-মিছরী-ফটকিরির মতন স্বচ্ছ, কেউ বা কাঠ-পাথরের মতন অ-স্বচ্ছ অর্থাৎ ভেতর দিয়ে আলো যেতে পারে না। এ বিষয়ে আর বেশী কিছু বলব না। তবে বুঝতে পারছ ত যে, কল-কব্জা ইত্যাদি তৈরী করতে হলে ঠিক জানা চাই কোন জিনিস কত শক্ত, কোন জিনিসের কি দোষ গুণ!

দেখ, কাঁচা লোহা পিটে নানা দ্রব্য গড়া যায়। ইচ্ছা করলে তাকে বাঁকান যায়, মোচড়ান যায়, কিন্তু ভাঙ্গা শক্ত। ইস্পাত লোহা বাঁকালে টং করে আবার সোজা হয়ে দাঁড়ায়। বেশী বাঁকাতে যাও জোর করে, ত ভেঙ্গে দুখানা হয়ে যাবে। তবু এই ইস্পাত নইলে ছুরী-ছোরাও হয় না, বন্দুক-পিস্তলও হয় না।

সোনা, রূপো, দুই খুব তল-তলে নরম পদার্থ। তাই গহনা গড়াবার জন্য, টাকা মোহর তৈরী করার সময়ে, তাতে তামার খাদ মিশিয়ে শক্ত করে নিতে হয়।

আগে তোমাদিকে ইঙ্গিতে জানিয়েছি যে, কঠিন জিনিসকে গরম করলে গলে তরল হয়ে যায়, তরল জিনিসকে ফোটালে ভাপ হয়ে উবে যায়। এটা কিন্তু সব সময়ে হয় না। এমন কোন কোন জিনিস আছে যা গলান যায় না, কেন না গরম করতে

করতে তার রূপান্তর হয়ে যায়। দুই একটা উদাহরণ দিয়ে কথাটা বুঝিয়ে দিই।

চা-খড়ি জান ত, যা দিয়ে ছেলেরা ইস্কুলে অঙ্ক কষে? সে পদার্থটা তৈরী চুন আর কয়লা-পোড়া ধোঁয়া দিয়ে। চুনের জলের ভেতর ফুঁ দিয়ে পরীক্ষা করতে বলেছিলাম, মনে আছে? জলটা প্রথমে ঘোলাটে হয়, তার পর এক রকম শাদা গুঁড়ো নীচে থিতিয়ে পড়ে। সেই গুঁড়োটা হচ্ছে চা-খড়ি। তোমার মুখের প্রশ্বাস আর চুন মিশে তৈরী হয়েছে। একে যদি গরম কর ত, ঐ দুটো পদার্থ আবার আলাদা হয়ে যাবে। চুন পড়ে থাকবে, ধোঁয়াটা বেরিয়ে যাবে। ঘুটিং, শামুক ঝিনুকের খোসা, এগুলোর ভেতর অনেকখানি চাখড়ি আছে। তাই ত ঐ পদার্থগুলো পুড়িয়ে চুন তৈরী হয়।

আর একটা খুব সোজা উদাহরণ দিতে পারি। পারা আর অক্সিজেন মিলে এক লাল টুকটুকে পদার্থ হয়, তার নাম হিঙ্গুল বা সিঁদুর। তাকে গরম কর, গলবে না। একটা ধোঁয়া বেরিয়ে যাবে, আর পড়ে থাকবে পারা। যেটা বেরিয়ে যাবে সেটা অক্সিজেন। কি করে বুঝবে যে, সেটা অক্সিজেন? একটা লোহার তার পুড়িয়ে লাল করে সেই ধোঁয়াতে ধর, দেখবে সুতোর মতন জলতে থাকবে। লাল আঙ্গরা ধরলে, দপ্ করে জলে উঠবে। এ সব খালী অক্সিজেনেই হয়। যদি একটা লম্বা কাচের পাত্রে এই পরীক্ষাটা কর, ত আর এক ব্যাপার দেখবে। পারা যেটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে, সেটাও ফুটে তার ভাপ বেরোবে। সেই ভাপের খানিকটা আবার তোমার পাত্রের

উপর দিকের কাচে লেগে জমে যাবে, সেখানটা আয়নার মতন দেখাবে।

এ সম্বন্ধে বড় বড় পরীক্ষার কিছু দরকার নেই। তাওয়াতে চাল তাতালে সেটা কিছু গলে যায় না। তার ভেতরটা ভাজতে আরম্ভ করে। ভেতরের জল যত বেরিয়ে যায়, চালটা তত লালচে হয় আর শুকোতে থাকে। এই ত চাল-ভাজা!

এখন, তাপের আর একটা কাজ দেখ। তাতালে কোন জিনিস গলে, কোন জিনিস রূপান্তর হয়, তা ত বুঝলে। কিন্তু তাতালে সব পদার্থই আকারে বেড়ে যায়। এটা নিশ্চিত। এই বেড়ে যাওয়া ধরবার যে সব যন্ত্র আছে, সেগুলোর কথা না বলেও তোমাদের কথাটা বোঝাতে পারব।

জ্বর-কাঠি দেখেছ ত, যা ডাক্তারবাবু রোগীর বগলে লাগিয়ে জ্বর দেখেন। তার ভেতরে এক খুব সরু নল আছে। তাইতে একটু পারা আছে। তাপ লাগলেই সেই পারা ওঠে, ঠাণ্ডা জিনিসে লাগলেই নামে। ওঠে, নামে, এর মানে ত বাড়ে কমে! এটা সহজেই বুঝতে পার।

রেল-গাড়ী যে লাইনের উপর দিয়ে চলে,- তার জোড়গুলো নজর করে দেখো। শীতকালে দেখবে যে, জোড়ে জোড়ে বেশ ফাঁক। জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্রে কিন্তু দেখতে পাবে যে, সে ফাঁক ঢের কমে গেছে। এর মানে, লাইনের লোহা তেতে বেড়ে গেছে, বই আর কি!

কাচের ছিপি দেওয়া শিশি দেখেছ ত! কখন কখন তার ছিপি এমন এঁটে যায় যে, টেনে, ঘুরিয়ে, কোন রকমে তাকে

নড়ান যায় না। তখন কি করতে হয় জান? শিশির গলাটা সাবধানে তাতিয়ে নিতে হয়। তাতলেই গলার ফাঁদল একটু বড় হয়, ছিপিটা সহজেই খুলে আসে।

এই রকম উদাহরণ অনেক দেওয়া যায়, কিন্তু আর বোধ হয় দরকার নেই। তোমরা নিশ্চয় মেনে নেবে যে, গরম করলে জিনিস বড় হয়।

কঠিন পদার্থ বেশ জমাট, তার কণাগুলো আঁটসাঁট অবস্থায় আছে, তাই তার একটা নিজস্ব গড়ন আছে। কিন্তু তবু কণাগুলোর মাঝে যে অতি সূক্ষ্ম ফাঁক আছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। গরম করতে করতে জিনিসটা বড় হয়, মানে এই ফাঁক বাড়তে থাকে। ফাঁক বাড়তে বাড়তে যখন এমন অবস্থায় পৌছল, যে পদার্থটার আঁট-সাট ভাব গিয়ে একটা ঢলে পড়ার ভাব এল, তখন সে গলতে আরম্ভ করলে।

গলে সবটা যখন তরল ঢল-ঢলে হল, তখন তাকে আরও গরম করতে থাক। ভেতরের ফাঁক আরও বেড়ে যাবে। বাড়তে বাড়তে আবার এক সঙ্গীন অবস্থায় এসে পৌছবে। কণাগুলোর মাঝের বাঁধন তখন এত ঢিলে হয়ে গেছে, যে তারা ছাড়া পেলেই চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়তে প্রস্তুত। তরল পদার্থটার তখন ফুটন্ত অবস্থা।

জল যখন ফোটে, তার ভাপের কত জোর তা সবাই দেখেছ। ভাত রাঁধবার সময়ে হাঁড়ীর মুখের সরাটা কেমন নাচতে থাকে! যদি এই সরাকে বেশ করে ময়দা দিয়ে এঁটে ভাত ফোটাও, ত ভীষণ কাণ্ড হয়ে যাবে। হঠাৎ দুম করে হাঁড়ী ফেটে

শত টুকরো হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। ভাত যাবে আগুনের ভেতর। জলের ভাপের এই শক্তি আছে বলেই ত জল ফুটিয়ে ইঞ্জিন চালান হচ্ছে। ফুটন্ত জলের জোরে বিশ তিরিশখানা গাড়ী বিদ্যুৎ-বেগে দৌড়চ্ছে, নয় ত এক সঙ্গে হাজার হাজার তাঁত চরকা চলছে।

আচ্ছা, এইবার ভেবে দেখ, এ রকম হয় কেন? তাতালে জিনিসের আকার বাড়ে কেন, তার কণাগুলোর মাঝের ফাঁক বড় হয় কেন? এই কণা কি এই ফাঁক, এরা এত সূক্ষ্ম যে অণুবীণ দিয়েও দেখা যায় না। সুতরাং ভেতরে কি হচ্ছে তা চোখে দেখে স্থির করা অসম্ভব। এই রকম ব্যাপারে পণ্ডিত লোকেরা একটা আন্দাজী কাজ-চলা নিয়ম-কানুন ঠিক করে নেন। যত ক্ষণ এই নিয়ম দিয়ে সব জিনিস বোঝা যায়, তত ক্ষণ নিয়মটা বলবৎ থাকে। কিন্তু যেই একটা ব্যতিক্রম ঘটল, কি আবার নূতন নিয়ম বাঁধতে হয়।

আন্দাজী নিয়ম শুনে নাক শেঁটকালে চলবে কেন! এ ত আমাদের জীবনে রোজ কত রকমে করতে হয়। মানুষ জন্মালেই সে একদিন মরবে, সূর্য্য রোজ সকাল বেলা উঠবে, তাল পাকলে ভুঁইয়ে পড়বে, উপর দিকে উড়ে যাবে না, এ সব ত আমরা কারণ না জেনেও ধরে নিই। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলি, কেন হয় জানি না, কিন্তু এই রকমই ত চিরদিন হয়ে আসছে। একটা সোজা মতন উদাহরণ দিয়ে কথাটা আরও পরিষ্কার করে দিই। তোমরা সবাই ছেলে-পিলের জন্য কলা কেন ত! একটা মোটামুটী নিয়ম ঠিক করে নিয়েছ, যে কলা

একটু নরম আর সোনালী রঙের হলেই খেতে মিষ্টি হয়। এই নিয়মে কাজ বেশ চলে যাচ্ছে। একদিন হল কি, এক ভাটিয়া বাবুর বাড়ী গিয়ে দেখে এলে যে, তারা এক রকম বোম্বাই দেশের কলা খাচ্ছেন, যা দেখতে কাঁচকলার মতন সবুজ, বাইরেটা বেশ শক্ত অথচ খেতে আমাদের চাঁপা কলার চেয়েও মিষ্টি। তোমার যে নিয়মটা ছিল কলার বাহিরেটা দেখে ভাল-মন্দ চেনবার, তা ত বাতিল হয়ে গেল! এখন করবে কি? একটা নূতন নিয়ম বাঁধতে হবে ত! নইলে দোকানীর কথা শুনে কলা কেনা ছাড়া উপায় থাকবে না।

তাপেরও এই রকম একটা ব্যাপার হয়েছিল। আগে লোকে ভাবত, যে তাপ পদার্থ-বিশেষ। তাই কোন জিনিস গরম হল মানে বুঝত যে, তাপের কণা গিয়ে সেই জিনিসের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে পড়ল। ভেতরে ঢুকলে, তাকে ঠাঁই দেবার জন্য পদার্থের কণাগুলো সরে সরে যায়। তাই পদার্থটা আকারে বাড়ে। লোকে অনেক দিন এই মেনে চলছিল। কিন্তু যখন খুব ভাল ভাল নিক্তি তৈরী হল, আর তা দিয়েও এতটুকু ওজন-বৃদ্ধি ধরা পড়ল না, তখন পণ্ডিতদের মনে সন্দেহ হল—তাপ যদি পদার্থ হয়, ত তার ওজন থাকতেই হবে, যত কমই হোক না কেন। যখন এটা কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না, তখন তাপ পদার্থ নয় আর কিছু! অনেক কল্পনা জল্পনার পর স্থির হল যে, তাপ মানে জড়কণার কম্পন। তার মানে, পদার্থ যত গরম হবে তার কণাগুলো তত কাঁপবে, আর এই কাঁপনের, নাচনের স্থান করতে হয় বলে সেটা আকারে বাড়বে।

তাপ

গরম জিনিস আস্তে আস্তে জুড়িয়ে যায় জান ত? কি করে এটা হয়, বোঝা দরকার। প্রথমে জিনিসটার লাগা চারিপাশের হাওয়া গরম হয়। গরম হলেই হালকা হল, উপরে ভেসে উঠল। নূতন হাওয়া এসে তার জায়গা নিলে। সে হাওয়াটাও গরম হয়ে উপরে ভেসে উঠল। এই রকম করে সেই পদার্থটার তাপ ধীরে ধীরে হাওয়াতে টেনে নেয়। যদি পাখা কর, ত শীগ্‌গীর জুড়োবে, কেন না হাওয়ার স্রোত আরও জোরে বইবে।

তা হলে হাওয়া না থাকলে কি হবে? জুড়োবে না। যদি একটা কৌটাতে গরম জিনিস ঝুলিয়ে রেখে তার ভেতরের হাওয়াটা দমকল দিয়ে বার করে দাও ত তাপ অনেক ক্ষণ থাকবে। যা একটু সামান্য তাপ বেরিয়ে যাবে সে সেই ঝোলান সুতোটার ভেতর দিয়ে। সাহেবরা যে বোতলে বরফ কি গরম চা নিয়ে ঘোরেন, তা দেখেছ কি? তার ভেতরেও এই ফন্দী। বোতলটার গা দুই পরদা কাচের, আর এই দুই পরদার মাঝের হাওয়া বার করে ফেলা হয়েছে। তাই বোতলের গা দিয়ে তাপ-চলাচল বন্ধ। যা একটু আধটু মুখের কাচটা দিয়ে যায়। ফলে গরম জিনিস অনেক ঘণ্টা গরম থাকে, ঠাণ্ডা জিনিস ঠাণ্ডা থাকে।

তাপ আবার সব জিনিসে সমান চলে না। উনোনের ভেতর থেকে জলন্ত কাঠের গোড়াটা ধরে স্বচ্ছন্দে টেনে বার করতে পারবে। কিন্তু একটা লোহার দাণ্ডা কিছুতেই পারবে না, হাত পুড়ে যাবে। কালো পাথর বাটিতে গরম দুধ সহজে জুড়িয়ে যায়, কিন্তু চকচকে মাজা কাঁসার বাটিতে অনেক ক্ষণ গরম থাকে।

আমাদের শরীরের একটা সাধারণ তাপ আছে, জান ত? জ্বর-কাঠি লাগিয়ে দেখলে বুঝবে যে, তার মাপ হচ্ছে সাড়ে আটানব্বই। তার বেশী হলে বুঝতে হবে, জ্বর হয়েছে। আর কম হলে বুঝতে হবে, নাড়ী দুর্ব্বল। চারিদিকের হাওয়ার তাপ এই সাড়ে আটানব্বইয়ের চেয়ে যত কমবে, তত আমাদের শীত বোধ হবে। শীত বোধ হলে আমরা জামা জোড়া পরি। জামা পরার মতলব এই যে, শরীরের তাপ বেরিয়ে না যায়। কি রকম জামা সব চেয়ে ভাল শীত আটকাতে পারে, বল দেখি! পশু-পক্ষীদের দেখ, তাদের গায়ে পালক কি রোঁয়া আছে। তারই জোরে তারা নিজের দেহের তাপ বাঁচিয়ে রাখে! এই যে পালক কি রোঁয়া, এর ভেতর অনেকখানি হাওয়া আটকে থাকে। সেই হাওয়াই হচ্ছে সব চেয়ে ভাল পোষাক। মানুষ যে লেপ গায়ে দেয়, সেও তাই। লেপের তুলোর ভেতর অনেক হাওয়া থাকে। কম্বলের বুনন এ রকম যে, তাতেও ঢের হাওয়া ধরে রাখে। যদি একটা আঁট-সাট লোহার ফতুই পরে শীতের দিনে তুমি ঘুরে বেড়াও, ত ভয়ানক কষ্ট পাবে। পাহাড়ের দেশে দেখেছি, যে গরীব লোকে পুরানো খবরের কাগজ জুড়ে জুড়ে রাত্রে গায়ে দেয়। তারা বলে যে, কাগজ দু তিন তা জুড়ে দিলে খুব শীত ভাঙে। এরও সেই একই কারণ। কাগজের ভাঁজে ভাঁজে অনেক হাওয়া থাকে, তার দরুন দেহের তাপ বেরিয়ে যায় না।

তাপের বিষয় আর একটু বলেই বন্ধ করে দেব। নইলে তোমাদের ধৈর্য্য থাকবে না। আচ্ছা, এটা বুঝেছ ত, যে গ্যাস পদার্থের কণাগুলোর নড়ন-চড়ন তরল পদার্থের চেয়ে ঢের বেশী?

তাই তরল পদার্থ যখন বাষ্প হয়, তখন তার আরও খানিকটা তাপ দরকার হয় তাকে বাষ্প অবস্থায় রাখবার জন্য। এ তাপ সে পাবে কোথা থেকে? তরল পদার্থটার ভেতর থেকেই টেনে টেনে নেয়। কলসীতে জল রাখলে, জল ঠাণ্ডা হয় কেন? কলসীর গায়ে ছোট ছোট ফুটো আছে। বালি-মাটির কুঁজোতে আরও বেশী ফুটো। এই ফুটোর ভেতর দিয়ে ক্রমাগত জলকণা বাহিরে আসছে আর বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে। বাষ্প হওয়ার সময়ে যে বাড়তি তাপ দরকার সেটা জল থেকেই টেনে নিচ্ছে, তাই ভেতরের জলটা ঠাণ্ডা হচ্ছে। হাত ভিজিয়ে হাওয়াতে ধরলে যে ঠাণ্ডা হয়, সেও এই জন্য। মানুষ শ্রান্ত হয়ে এসে মুখে চোখে জল দিলে যে আরাম হয়, সেও এই জন্য। যে জিনিস জলের চেয়েও শীগ্‌গীর শুকোয় সেটা আরও বেশী ঠাণ্ডা হয়, যেমন ইস্পিরিট, পেট্রল। জল আগুনে ফোটবার সময়ে এটা বোঝা যায় না, তার কারণ এই যে, বাষ্পের যত তাপ দরকার হয়, সেটা আগুন থেকেই টেনে নেয়।

জলকে এই উপায়ে এত ঠাণ্ডা করা যায় যে, জমে বরফ হয়ে যায়। তবে করতে হয় কি, জলের উপরের হাওয়াটা দমকল দিয়ে টেনে নিতে হয়। বায়ুমণ্ডলের চাপ সরে গেলেই জলটা বুড়-বুড় করে ফুটতে থাকে। খুব শীগ্‌গীর ফোটে। তবে এ ত আর আগুনের উপর ফোটা নয়। বাহিরের তাপ নেই, যত তাপ দরকার সব টানছে সেই জলের ভেতর থেকে। শেষ দুধে যেমন সর পড়ে, সেই রকম জলটার উপর একটা বরফের সর পড়বে। তার পর ধীরে ধীরে জমে যাবে। এই রকম বরফের বড় বড় কল

আছে, যাতে হাজার হাজার মণ বরফ তৈরী হচ্ছে, কেবল পম্প করে জলটাকে ফুটিয়ে।

শুধু যে তরল পদার্থ হাওয়াতে শুকিয়ে যায়, তা নয়। অনেক কঠিন জিনিস থেকেও ভাপ বেরোয়। কর্পূর চেন ত? খোলা যায়গায় রেখে দিলে উবে যায়। মাথা ধরলে, কপালে যদি কর্পূর ঘস, ত সুন্দর ঠাণ্ডা বোধ হবে। কেন? কর্পূরের ভাপ তোমার কপাল থেকে তাপ টেনে নেবে, সেই জন্য। মৃগনাভি বা কস্তরী বলে এক রকম সুগন্ধি জিনিস আছে, তাকেও বাহিরে ফেলে রাখার জো নেই। উবে যাবে আর চারিদিক কস্তরীর ভাপের গন্ধে ভরে যাবে।

তাপ সম্বন্ধে একটা কথা এখনও বলা হয় নেই। যখন আলোর বিষয় বলব, তখন বোঝাব। এখন একটু আভাস দিয়ে রাখি। তাপ যদি শুধু পদার্থে পদার্থে ছোঁয়া লেগে চলত, তা হলে সূর্য্যের তাপ আমরা পেতাম না। কেন না, সূর্য্য আর পৃথিবীর মাঝে কত কোটি ক্রোশ জায়গা একেবারে খালী। সেখানে না আছে অক্সিজেন, না আছে নাইট্রজেন। তা হলে তাপ আসে কি করে? রোদ গরম কেন? মোটামুটি বলতে, সূর্য্যের আলো যে উপায়ে আসে, সূর্য্যের তাপও সেই উপায়ে আসে। একে বলে তাপ-বিকিরণ।

আমার তাপের কথা হয়ে গেল। এইবার অন্য শক্তিগুলোর বিষয় বলব। তবে এই কথা তোমাদের বরাবর মনে রাখতে হবে, যে সব শক্তিই এক। একটা আর একটার রূপান্তর, তাপ-শক্তির সঙ্গে নড়াচড়ার কি সম্পর্ক, তা ত মোটামুটি বুঝিয়েছি।

তাপ

কাঠে কাঠে ঘসে যে আগুন জ্বলে, এ ত সেই আদ্ভ কালের বুনোরাও জানতে পেরেছিল। এই সে দিনের কথা, আমাদের ছেলেবেলাতেও পাড়াগাঁয়ে লোহা আর চকমকি পাথর ঠুকে আগুন জ্বালা হত। আর এই যে তোমাদের দেশলাই, এও ত ঠুকতে হয়! হাত পা না নেড়ে জ্বালাও দেখি!

শব্দ

মহাশক্তির আর এক রূপ, শব্দ বা ধ্বনি। ইনি কারও চেয়ে খাটো নন। এ দেশের মুনি-ঋষিরা বলতেন, যে সৃষ্টির আরম্ভে গভীর ওঙ্কার ধ্বনিতে অনন্ত আকাশ ভরে গেছল। একজন যবন ঋষি বলে গেছেন যে, মহা আকাশে দিবারাত্র গ্রহ-তারার মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এ সব অতি সুন্দর কবি-কল্পনা। কিন্তু আসল কথা এই যে, শব্দ-শক্তিটা নিতান্তই আমাদের এই বসুন্ধরার জিনিস। বাহিরে থেকে আসতে পারে না, কারণ তার ফাঁকা জায়গা দিয়ে চলবার ক্ষমতা নেই। এক পা, এক পা করে জড় পদার্থের মধ্যে ঢেউ তুলে তুলে তাকে এগোতে হয়। কি রকম, বলি শোন।

জলে একটা ঢিল ফেলে দিলে যে রকম ঢেউ উঠে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, শব্দেরও তাই। দেখেছ ত, ঢেউ যত দূরে দূরে চারিয়ে যায়, ততই ছোট হয়ে যায়। শেষ, আর দেখা যায় না। মিলিয়ে যায় জলে। একটা প্রকাণ্ড পর্ব্বত ভেঙ্গে জলে ফেলে দিলেও কিছু জগতের সারা সমুদ্র নাচবে না। তেমনি হাজারটা প্রকাণ্ড তোপ ছুঁড়লেও তার আওয়াজ কিছু সারা বায়ুমণ্ডলকে কাঁপাতে পারবে না। তা যদি হত, ত জার্ম্মান মহাযুদ্ধের

সময়ে তোপের আওয়াজে এ দেশে আমাদের খুব হত না!
আচ্ছা, তা হলে এটা ঠিক হল ত, যে শব্দ যত দূরে যাবে, অস্পষ্ট হতে থাকবে, খানিকটা গেলে আর শোনা যাবে না?

আর এক কথা। শব্দ যখন হাওয়াতে ঢেউ তুলে তুলে এগোয়, তখন তার চলতে খানিকটা সময় লাগবেই ত! যত দূর, তত বেশী সময় লাগবে। এ ব্যাপার খালী চোখেই বেশ দেখা যায়। কাছে কেউ বন্দুক ছুঁড়লে, বন্দুকের ধোঁয়াও যেই দেখা যাবে তার আওয়াজও তখনই শোনা যাবে। কিন্তু দূরে বন্দুক ছোঁড়া দেখে থাক ত নিশ্চয় তোমাদের মনে আছে যে, ধোঁয়া নজরে পড়ার বেশ একটু পরে তার দুড়ুম আওয়াজটা কানে পৌঁছেছিল। ঝড় বৃষ্টির সময়ে আকাশের দিকে নজর কোরো, দেখতে পাবে যে, বিজলী চমকাবার অনেক পরে তার গুড়গুড়ুনি কানে আসবে।

গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে ওপারে নজর করলে, এ রকম অনেক ব্যাপার দেখা যায়। হয় ত ওপারে একটা নৌকা থেকে ঘর ছাইবার টীনের চাদর নামাচ্ছে! কুলীরা একটা একটা করে টীন ঝনাৎ করে ভুঁইয়ে ফেলছে। তুমি ফেলাও দেখতে পাবে, ঝনাৎ আওয়াজও শুনবে। কিন্তু আওয়াজটা কানে পৌঁছবে বেশ একটু পরে।

তা হলে ধরে নিলাম যে, তোমরা ঠিক বুঝতে পারলে, শব্দ চলতে সময় লাগে!

শব্দ যে একেবারে শূন্যের মধ্য দিয়ে চলে না, তাও দেখান কঠিন নয়। কিন্তু দেখাতে হলে, একটা হাওয়ার কল চাই।

একটা বড় বাক্স কি কৌটায় ভেতরে সুতো দিয়ে একটা ঘণ্টা লটকে দাও! বাক্স নাড়লেই ঘণ্টা বাজবে, বাহিরে থেকে বেশ শুনতে পাবে। তার পর দমকল লাগিয়ে ভেতরের হাওয়াটা বের করে ফেল। তখন তোমার ঘণ্টা ত একেবারে শূন্যে ঝুলছে! বাক্সটা ধরে যতই নাড়া দাও ঘণ্টার টুং-টাং শুনতে পাবে না। বাক্সের অক্সিজেন নাইট্রজেন বার করে ফেলে দিয়েছ, আর কিসের মধ্যে শব্দের ঢেউ উঠবে? সামান্য একটু টিং-টিং যদি শুনতে পাও, ত সে ঝোলান সুতোটার কাঁপুনির দরুন।

শব্দ তা হলে, জড় পদার্থের আশ্রয় না পেলে চলে না। জড়কণাগুলোর মাঝে ঢেউ তুলে তুলে এগোয়। কঠিন, তরল, কি ধোঁয়াটে, সব রকম পদার্থই শব্দ বয়ে নিয়ে যেতে পারে। তবে কঠিন পদার্থ সব চেয়ে ভাল পারে। একটা লম্বা তক্তার এক দিকে তোমার ট্যাঁক-ঘড়ীটা রেখে অন্যদিকে কান লাগাও। ঘড়ীর টিক্-টিক্ খুব স্পষ্ট শুনতে পাবে। শুধু তাই কেন, এক দিকে যদি নখ দিয়ে আস্তে আস্তে আঁচড়াও, ত সে আওয়াজও কাঠের ভেতর দিয়ে অন্য দিকে শোনা যাবে।

তোমাদের একটা খেলনার কথা বলি। তৈরী করে দেখো, খুব মজা পাবে। দুটো বাঁশের চোঙ্গা নাও, লম্বায় এক কি দেড় বিঘৎ। দুটোরই একটা মুখ কাগজ বা পাতলা চামড়া দিয়ে ডুগডুগির মতন ছেয়ে ফেল। তার পর, পঞ্চাশ গজ আন্দাজ লম্বা একটা মজবুত সুতো জোগাড় করে তার দু দিকে দুটো ছোট্ট কাঠি বাঁধ। চোঙ্গা দুটোর মুখের পরদায় ছোট্ট ফুটো করে তাইতে ঐ কাঠি পরিয়ে দাও। টেলিফোন কল তৈরী

হয়ে গেল। এইবার দুজনে দুটো চোঙা ধরে দূরে দূরে দাঁড়াও। তোমাদের মাঝে সুতোটা টেলিগ্রাফের তারের মতন টান হয়ে যেন ঝোলে। এক জন চোঙার মধ্যে আস্তে আস্তে কথা কও। অন্য জন তার চোঙা কানে লাগিয়ে শোন। চমৎকার শুনতে পাবে, প্রত্যেক কথাটা। বুঝতে পারবে যে, হাওয়ার চেয়ে কত ভাল শব্দবাহক তোমার সুতো!

শহরে, কারখানায়, যে টেলিফোন থাকে সেও এই একই জিনিস। শুধু তাতে একটা পরদার কাঁপুনি আর এক পরদায় পৌঁছে দেয়, সুতো নয়, বিজলীর শক্তি। বিজলী কি করে এ কাজ করে, তা পরে তোমাদের বোঝাব।

জলও খুব ভাল শব্দ বয়ে নিয়ে যেতে পারে। বেশ বড় পুকুরেরও এ-পাড় থেকে ও-পাড়ে কথা স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যায়। যারা বান দেখেছ, তারা জান যে, বেনো জলের উপর দিয়ে কত দূরের আওয়াজ কানে আসে। জলের ভেতরেও বেশ আওয়াজ শোনা যায়। যারা সাঁতার জান, পরীক্ষা করে দেখো। কিন্তু নিজেরা হাত পা ছুঁড়ে বেশী গোলমাল করলে আর শুনবে কি করে!

তা হলে কি ঠিক হল? শব্দ-চলাচলের জন্য জড়-কণা চাই, শূন্য পথে শব্দ চলে না। জড় পদার্থের ভেতর কঠিন পদার্থ সব চেয়ে ভাল শব্দ-বাহক, তার পর জল, তার পর হাওয়া। সব চেয়ে বড় কথা তোমরা যা শিখলে সেটা এই যে, শব্দ একটা আজগুবী কিছু নয়, জড় পদার্থের কাঁপন মাত্র। তাপ এক রকমের কাঁপন, এ আর এক রকমের।

আমরা আওয়াজ শুনি ত কান দিয়ে। সেই কানের ভেতর আছে কি? প্রথম একটা আঁকা-বাঁকা গর্ত, তার শেষে এক পাতলা চামড়ার পরদা। সেই পরদা থেকে মগজ পর্য্যন্ত চলে গেছে সরু সরু শিরা। শব্দের ঢেউ ঢুকে ভেতরের পরদাটাকে কাঁপায়, আর সেই কাঁপনের খবর শিরায় শিরায় মাথায় গিয়ে পৌঁছায়। মগজের মধ্যে চোখ কানের সব আলাদা আলাদা আপিস আছে, এ কথা তোমাদের বলেছি। কানের আপিসে কাঁপনের খবর পৌঁছলেই শব্দ শোনা হল। পরদা কোন রকমে জখম হলে শোনা বন্ধ। মানুষ কালা হয়ে গেল।

আচ্ছা, জলের ঢেউ পাড়ের বাঁকে লেগে বেঁকে যায়, এ নিশ্চয়ই তোমাদের নজরে পড়েছে। শব্দের তরঙ্গেরও ঠিক এই ব্যাপার হয়। একটা সোজা পরীক্ষা বলি, করে দেখো। মনে কর, দূর থেকে কারও আওয়াজ আসছে, যা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে না। দু-হাতের চেটো গোল করে কানের পেছনে ধর, দেখবে যে, আওয়াজের জোর কত বেড়ে যাবে। সব সাফ বুঝতে পারবে। কি করে হল, বলতে পার? কতকগুলো শব্দের ঢেউ ত সোজা কানে ঢুকছিলই। এখন হাতের চেটোয় লেগে আরও অনেক ঢেউ বেঁকে কানে ঢুকল, তাই কানের পরদা বেশী জোরে কাঁপতে লাগল, শব্দের জোরও বেড়ে গেল।

প্রতিধ্বনিও এই রকম করে হয়। প্রতিধ্বনি কখন শুনেছ! পাহাড়ের মাঝে একবার বন্দুক ছুঁড়লে, একটা আওয়াজ না হয়ে অনেকগুলো হয়। ঐ রকম জায়গায় কাউকে চেঁচিয়ে হাঁকলে পাহাড়গুলো সেই হাঁক ফিরিয়ে দেয়। ধর তুমি ডাকলে,

"কেউ কোথায় রে?" গম্ভীর গলায় চারিদিক থেকে জবাব আসবে, "কোথা রে?" তুমি যদি বোকা ভয়-তরাসে লোক হও ত ভূত, ভূত করে পালাবে। কিন্তু এতে ভূতুড়ে কিছুই নেই। তুমি চেঁচিয়ে হাওয়াতে যে ঢেউ তুলেছ, সেই ঢেউগুলো পাহাড়ে লেগে ফিরে আসছে মাত্র। গভীর ইদারার ভেতর থেকেও এই রকম কথা ফিরে আসে। বড় সাঁকোর নীচেও প্রতিধ্বনি শোনা যায়। কত মন্দির, গির্জ্জা, মসজিদের চূড়ো কি গম্বুজের নীচেও কথা কইলে গম্ গম্ করে। এই প্রতিধ্বনির জন্যই ত ঐ সব বিখ্যাত ধর্ম্ম-মন্দিরে ভজন-গান এত গুরু-গম্ভীর শোনায়।

আচ্ছা, এই যে বায়ুমণ্ডলে ঢেউয়ের কথা বললাম, এটা ঠিক বিশ্বাস হল ত? ধর, খুব জোরে হাওয়া দিচ্ছে। তার মাঝে কথা কইবার সময়ে নিশ্চয় দেখেছ যে, হাওয়ার সঙ্গে তোমার আওয়াজ কত দূর যায়, কিন্তু উল্টো দিকে না চেঁচালে প্রায় কিছু শোনা যায় না। জলের স্রোতে ইট-পাটকেল ফেলে দেখো, স্রোতের সঙ্গে ঢেউগুলো কত দূর ছুটবে। কিন্তু উল্টো দিকে ঢেউ প্রায় উঠবে না।

ঢোলকে ঘা মারলে তার চামড়াটা কাঁপে, বেহালা সারঙ্গীতে ছড়ি টানলে তার তাঁত কাঁপে, এ ত শুধু চোখেই দেখা যায়। শানাইয়ের মুখে একটা পাতলা জিবের মতন আছে, ফুঁ দিলে সেটা কাঁপে। ছেলেরা যে পাতার বাঁশী তৈরী করে, তার মুখেও ঐ রকম একটা ছোট্ট পাতার আলজিব করে দেয়, তবে সেটা ঠিক বাজে। মানে এই হল ত, যে পদার্থের এই কাঁপন

হাওয়াতে ঢেউ তোলে, আর সেই ঢেউ তোমার কানের পরদা নাচায়।

বাঁশের ঝাড়া বাঁশীতে ত তাঁতও নেই, জিবও নেই, সেখানে কি কাঁপে, বল দেখি! কেন, তার ভেতরের হাওয়াটা তোমার ফুঁয়ের জোরে কাঁপে! ঝড়ের সময়ে হাওয়ার জোরে ঘরে-দোরে, বনে-জঙ্গলে কত রকম বাঁশীর আওয়াজ হয়, শুনেছ ত? ঝাউ-বনে হাওয়া দিলে মনে হয়, কে যেন বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে। ঝাউ গাছের সরু সরু পাতাগুলো হাওয়াতে কেঁপে ঐ রকম আওয়াজ তোলে।

একটা খালী শিশির কানায় মুখ লাগিয়ে ফুঁ দাও, তার ভেতরের হাওয়ার কাঁপনে শিশ্‌ দেওয়ার মতন শব্দ হবে। আচ্ছা, শিশিটায় একটুখানি জল ঢেলে আবার ফুঁ দাও। দেখবে যে, শিশির স্বরটা বদলে গেছে। আরও জল দাও, আর এক স্বর বেরোবে। এর মানে, শিশির ফাঁদলটা ছোট বড় করে নানা স্বর বার করা যায়। বাঁশের বাঁশীতে ছেঁদাগুলো টিপে টিপে তার ফাঁদল ছোট বড় করা হয়। তাই নানা স্বর বাজে!

আমাদের মুখের ভেতর এই ব্যাপার নিত্য হচ্ছে। মুখের ফাঁদল যে কেবল ছোট বড় হচ্ছে তা নয়, জিব নেড়ে ঠোঁট নেড়ে আমরা মুখের গর্ত্তটার গড়ন ক্রমাগত বদলাচ্ছি। তাই ত আমরা মুখ থেকে এত রকমের আওয়াজ বার করতে পারি! বুকের হাপরের হাওয়া গলার নলী দিয়ে মুখে আসে। সেটা কি ভাবে বেরোবে, তার উপর নির্ভর করছে কি রকম শব্দ হবে। নিজে নিজে পরীক্ষা করে দেখলে ঠিক বুঝতে পারবে। 'উ' বলবার

সময়ে হাঁ-মুখটা সরু-ছুঁচোল হয়। 'ও' বলতে গেলে আর একটু খোলে। 'অ' বলতে আর একটুকু। 'ই' বলবার সময়ে মুখটা ভেটকে যায়, ঠোঁট দুটো লম্বা হয়ে যায়। এই অবস্থায় আর একটু হাঁ করলেই, 'এ' হয়। বেশী হাঁ করলেই 'আ'।

এই ত গেল স্বরবর্ণ। ক, খ ইত্যাদি ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ করবার সময়ে জিবটাকে নানা রকম খেলাতে হয়। হাপরের হাওয়াটাকে জিব মুখের ভেতর নানা জায়গায় ঠেলে নিয়ে যায়। গলায় ঠেললে কগ, দাঁতে ঠেললে তদ, বন্ধ ঠোঁটে ঠেললে পব; দাঁতের মাড়ির পাসে ঠেললে চ জ, আর জিব উল্টে টাগরায় ঠেললে ট ড। নিজে পরীক্ষা করে দেখো, কোন সন্দেহ থাকবে না। অন্য অক্ষরগুলোর কথা আর বলব না। তবে ন ম ঁ এ সব শব্দ নাক বন্ধ করে বার করবার যো নেই। খানিকটা হাওয়া নাক দিয়ে ছাড়তেই হবে।

প্রাণী-জগতে এক মানুষেরই কথা কওয়ার বিদ্যা আছে। তার মাথার ভেতর বুদ্ধি আসার পর, সে জিবের কসরৎ করে এই বিদ্যার সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেক খোকা-খুকী কি রকম করে আস্তে আস্তে সব অক্ষর উচ্চারণ করতে শেখে, তা তোমরা সবাই দেখেছ। তবে খোকা-খুকী শুনে শুনে শেখে। আদ্যকালের মানুষের শেখাবার লোক ত কেউ ছিল না!

কোন যন্ত্র আপনা হতে কথা কইতে পারে না। গ্রামোফোন যে কথা কয়, সে ত আগে কেউ তার ভেতর কথা কয়ে রেখেছে, তাই! মানুষের নিজের মুখের কথাই ধরে রাখা হয়েছে কলে। কি করে ধরে রেখেছে, তা তোমাদিকে মোটামুটি বলি শোন।

খেলার টেলিফোনের কথা মনে আছে ত, সেই যে একটা চোঙায় কথা কয়ে অন্য চোঙায় শুনতে হয়। আচ্ছা ধর, প্রথম চোঙার পরদার কাঁপনটা তখনই সুতো দিয়ে চালিয়ে না দিয়ে লিখে রাখলে, তা হলে কেমন হয়! পরদার উপরে একটা ছুঁচ লাগিয়ে দাও। আর ছুঁচের ডগায় ঠেকিয়ে একটা নরম মোমের চাকতী কলে ঘোরাও। চাকতীর উপর একটা গোল দাগ পড়ে যাবে। যত ক্ষণ পরদা কাঁপবে না, তত ক্ষণ সে দাগটা সমান গভীর থাকবে। কিন্তু যেই চোঙায় কথা কইলে, কি পরদা কাঁপল। পরদা যত কাঁপবে, ছুঁচটাও তত নড়বে। তখন গোল দাগগুলো সমান হবে না, কোথাও বেশী কোথাও কম গভীর হবে। দেখতে ফুটকী-ফুটকী হবে।

এই দাগটায় ঠেকিয়ে যদি পরে ছুঁচ চালাও, ত পরদা কথা কইবার সময়ে যে রকম কেঁপেছিল ঠিক সেই রকম আবার কাঁপবে। তা হলে সেই সমস্ত কথা আবার শোনা যাবে। এই হল গ্রামো-ফোনের হিকমৎ। এই উপায়ে আমরা আজ ঘরে বসে বসে কত বড় বড় ওস্তাদের গান শুনতে পাই।

আসল গ্রামোফোনের পরদা হয় অভ্রের। আর মোমের চাকতীতে প্রথম কাঁচা রেকর্ড করে, পরে শক্ত কাঁচ কড়ার রেকর্ড তৈরী হয়। সেগুলো সহজে নষ্ট হয় না।

শব্দশক্তির কথা আমার বলা হয়ে গেল। আশা করি, তোমরা এর রহস্য একটু আধটু বুঝলে।

আলো

তোমাদের কাছে এর আগেই প্রাচীন পণ্ডিতদের পঞ্চভূতের নাম করেছি। মনে আছে ত, পাঁচটার মধ্যে দুটার কথা পরে বোঝাব বলে রেখে দিয়েছিলাম? এই দুটী হচ্ছে, আগুন আর আকাশ। আগুন মানে বুঝতে হবে তেজ বা শক্তি। এই শক্তি নানা রূপ ধরে। তার তিনটী রূপের সঙ্গে তোমাদের চেনা-পরিচয় হয়েছে—নড়া-চড়া বা গতি, তাপ ও শব্দ। এটাও দেখেছ যে, এই তিন শক্তির সঙ্গে জড়কণার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

এইবার তোমাদিকে যে শক্তির কথা বলব, তার বাহন জড়-কণা নয়, স্বয়ং আকাশ। আলো আঁধার ত সবাই জান! অন্ধকারে কোন জিনিসই দেখা যায় না। কিন্তু যেই তার উপর আলোর কিরণ পড়েছে, কি তার ছবি আমাদের চোখে এসে পৌঁছেছে। আচ্ছা, এই যে শক্তি, যা আমাদের সকল জিনিস দেখায়, যা নইলে আমরা চোখ থেকেও অন্ধ, সেটা কি? এ ত শব্দের মতন জড়-কণার কম্পন কি হাওয়ার তরঙ্গ হতে পারে না। কেন না, আমাদের আলোর প্রধান ভাণ্ডার সূর্য্যদেব থাকেন মহাশূন্যের মাঝে। কে বয়ে নিয়ে আসে তবে এই আলো

মহাকাশ ভেদ করে? পণ্ডিতেরা কল্পনা করেছেন যে, আমরা যাকে মহাকাশ বলি সে স্থান যথার্থ শূন্য নয়, ইথারের মহাসমুদ্র। তাকে শূন্য নাম দিয়েছি, কেবল তাতে জড় পদার্থ নেই বলে। এই ইথার জলে, স্থলে, আকাশে, এমন কি জড়কণার ফাঁকে ফাঁকে পর্য্যন্ত সর্ব্বদা রয়েছে। একে দেখা যায় না, এর গুণ কি স্বরূপ আমরা কেউ জানি না, কেবল এইটুকু ধরে নিয়েছি যে, আলো, বিজলী ইত্যাদি কতকগুলো শক্তিকে বয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতা এর আছে। আলো হচ্ছে এই ইথারের তরঙ্গ।

আগে তোমাদের তাপ-বিকিরণের কথা বলেছি। সূর্য্য থেকে আমরা যে তাপ পাই, সেও এই ইথার-সাগরে ঢেউ তুলে এগিয়ে আসে। পরে বিজলীর ঢেউয়ের কথাও তোমাদের বলব। এই নানা রকম ঢেউয়ের তফাৎ হচ্ছে এই যে, কোনটা বেশী লম্বা, কোনটা কম।

আলো যখন ঢেউ তুলে এগিয়ে আসে, তখন তার চলতে নিশ্চয়ই সময় লাগে। এটা ত অনায়াসে বুঝতে পারছ! তবে এ ত আর শব্দের ঢেউ নয়। এর বেগ এত বেশী যে, কোন সহজ উপায়ে তা দেখান সম্ভব নয়। আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর কোন জিনিসের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। কিন্তু অনন্ত আকাশের কাছে আলোকও হার মানে। আমাদের সব চেয়ে নিকটের নক্ষত্র থেকেও পৃথিবীতে আলোর কিরণ পৌছতে তিন চার বছর লাগে। এর মানে কি হল, ধারণা করতে চেষ্টা কর। যদি কানোপস্ নক্ষত্র হঠাৎ ধ্বংস হয়ে যায়, ত তিন চার বছর আমরা তার খবর পাব না। এই তিন চার বছর রোজ রাত্রে আমরা

কানোপস্‌কে আকাশে তার স্থানে দেখতে পাব। তার পর হঠাৎ একদিন দেখব, সে নেই। আলোর তরঙ্গ সূর্য্য থেকে রওয়ানা হয়ে পৃথিবীতে আসতে আট-নয় মিনিট সময় লাগে। এ সব কথা ভাবতেও মাথা ঘুরে যায়!

আলোর বেগ মাপবার যন্ত্র আছে, তবে তোমরা আরও অনেক না শিখলে সে যন্ত্র তোমাদের বোঝান সম্ভব হবে না। তাই অন্য কথা বলি।

আচ্ছা, সূর্য্যের আলো ত, আমরা যতটা দেখতে পাই, সাদা! কিন্তু সেই আলো পড়ে পাতা সবুজ দেখায় কেন, সিন্দুর লাল দেখায় কেন, সূর্য্যমুখী ফুল হলদে দেখায় কেন? তার চেয়েও আশ্চর্য্য কথা, উদয় অস্তের সময়ে আমরা এই সাদা সূর্য্যকেই লাল্‌চে দেখি কেন? এ সব ভেবে দেখবার মতন কথা। আসল ব্যাপার হচ্ছে যে, সূর্য্যের আলোতে এই সব রঙগুলোই আছে। তোমরা আকাশে রামধনু উঠতে নিশ্চয় দেখেছ। তার আর এক নাম ইন্দ্রধনু। কিন্তু সত্যি সে ত কারও ধনুক নয়। সূর্য্যের সাদা আলো আস্‌মানে জলের কণার মধ্য দিয়ে আসতে আসতে ভেঙে সাত রঙ হয়ে যায়। এটা নিজেরাই পরীক্ষা করে দেখতে পার। এক কুলকুচো জল মুখে নিয়ে ফুঁ করে রোদের পানে ফোয়ারা দিয়ে উড়িয়ে দাও। দেখবে, তার ভেতর ছোট্ট রামধনু উঠেছে।

এক গামলা জলে দুই চার ফোঁটা তেল ছেড়ে দাও। তেল ত জলের চেয়ে হালকা, জলে ভাসবে। তোমার দুই ফোঁটা তেল জলের উপর যখন বেশ করে চারিয়ে যাবে, অর্থাৎ যখন খুব ছোট

ছোট কণায় ভাগ হয়ে যাবে, তখন তার ভেতর রামধনুর সাত রঙ দেখতে পাবে।

ঝাড়ের কলম কি অন্য কোন পল-কাটা কাচের উপর রোদের কিরণ পড়লেও ভেঙে সাত রঙ হয়ে যায়। এই সাত-রঙা ছোট্ট রামধনুর সামনে যদি আর একটা কলম উল্টো করে ধর, ত রঙগুলো মিশে আবার সাদা হয়ে ও-পাশে বেরোবে।

সাত রঙ এক করবার আর একটা সহজ পরীক্ষা তোমাদের বলতে পারি। একটা কাগজের চাকতী নিয়ে, তার ঠিক মাঝখান (কেন্দ্র) থেকে রেখা টেনে টেনে তাকে সাত ভাগ কর। তার পরে রঙীন পেনসিল দিয়ে প্রত্যেক ভাগে রামধনুর এক একটা রঙ মাথাও। কাগজটা এখন দেখতে সাত-রঙা চাকার মতন হল। ঐ চাকা একটা লাট্টুর মাথায় এঁটে, কি অন্য কোন রকমে যদি খুব জোরে ঘোরাও ত তার রঙ সাদা দেখবে।

এই পরীক্ষাগুলো যদি সামনাসামনি তোমাদিকে করে দেখাতে পারতাম ত ভাল হত। কিন্তু তা ত আর হবার নয়। নিজেরাই যা পার করে নিও। সহজেই দেখতে পাবে যে, সাতটা রঙ মিলে সাদা হয়। রামধনুর সাত রঙ কি কি, তাত তোমরা চোখেই দেখেছ। তবু একবার বলি তাদের নামগুলো—লাল, নারঙ্গী (কমলা লেবুর রঙ), হলদে, সবুজ, আস্‌মানী, নীল (নীল বড়ির নীল), বেগুনী। এরা সবাই কিন্তু আলাদা আলাদা রঙ নয়। তোমরা নিশ্চয় জান, লাল আর হলদে মেশালে নারঙ্গী হয়, লাল আর নীল মেশালে বেগুনী হয়, হলদে আর নীল মেশালে সবুজ হয়। তার পর আবার এই সাতটা ছাড়াও এ-পাশে ও-পাশে

X—কিরণের ফটোগ্রাফ

আরও সব অদৃশ্য আলো আছে। তাদের দুটো একটার কথাও পরে বলছি।

স্বচ্ছ পদার্থ মানে, কাচের শার্শী, পরিষ্কার জল, এই সব। স্বচ্ছ জিনিসের ভেতর দিয়ে আলো অবাধে চলে যায়, এ-পাশ থেকে ও-পাশের সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু একেবারে স্বচ্ছ পদার্থ ত সংসারে নেই। কাচই বল, জলই বল, হাওয়াই বল, বেশী পুরু হলে তার নিজের একটা রঙ থাকে। অস্বচ্ছ পদার্থ মানে, যার ভেতর দিয়ে আলো যায় না। কিন্তু একেবারে অস্বচ্ছও জগতে কিছু নেই। খুব পাতলা করে কেটে যে কোনও জিনিস রোদে ধর, দেখবে যে তার ভেতর দিয়ে কিছু আলো আসছে।

এই একটু আগে তোমাদের বললাম যে, রামধনুর সাত রঙ ছাড়াও সূর্য্যের আলোতে অনেক অদৃশ্য কিরণ আছে। অদৃশ্য এই জন্য যে, সে কিরণগুলো আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। এমন কিরণ আছে, যা পাহাড় ভেদ করে চলে যায়। রেডিয়ম বলে এক ধাতু আছে, যার ভেতর থেকে ক্রমাগত এক রকম অদৃশ্য আলো বেরোচ্ছে। সেই আলো দিয়ে নানা-রকম কঠিন ব্যারামের চিকিৎসা হয়। রেডিয়ম অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য জিনিস। আমাদের সারা ভারতবর্ষে কয় রত্তিই বা আছে!

একটা কিরণের কথা কিন্তু তোমরা শুনে থাকবে। তার নাম এক্স-কিরণ। মানুষের হাড়-টাড় ভেঙ্গে গেলে, কি দেহের ভেতর কোথাও গুলি আটকে থাকলে, হাসপাতালে এক রকম ফটো তোলে এই কিরণের সাহায্যে। সেই ফটোতে ভেতরের

হাড়ের কি গুলির ছায়া পরিষ্কার দেখা যায়। অর্থাৎ এক্স-কিরণ মাংস ভেদ করে যেতে পারে, হাড় কি ধাতু ভেদ করে যেতে পারে না।

এই যে নানা রকম আলো বা কিরণ, এরা সবাই ইথারের ঢেউ। কেউ বা বড় ঢেউ, কেউ বা ছোট।

এইবার তোমাদিকে বোঝাতে হবে, সিন্দুর লাল কেন? আচ্ছা, প্রথমে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। এটা তোমরা জান ত, যে সিন্দুরকে লাল দেখায় সাদা আলোতে কিম্বা লাল আলোতে! নীল সবুজ আলোতে কিছুতেই লাল দেখাবে না। ইচ্ছা হয়, সবুজ দেশলাই জ্বেলে পরীক্ষা করে দেখো। এর মানে কি হল? যে আলোতে লালের ভাগ আছে, সে আলো নইলে সিন্দুরকে লাল দেখাবে না। সিন্দুর পদার্থটার উপর যখন সাদা আলো পড়ে, সে লাল ছাড়া অন্য রঙ্গ খেয়ে ফেলে। গাছের পাতা তেমনি সবুজ ছাড়া অন্য ছয় রঙ্গ খেয়ে ফেলে। গোধূলির সময়ে পাতা লাল্‌চে দেখায় এই জন্য, যে সে সময়ে সূর্য্যের আলোতে সাদার ভাগ কম, অত সবুজ পাবে কোথায়! প্রত্যেক পদার্থ এই যে কতকগুলো রঙ্গ খেয়ে নেয়, আর একটা রঙ্গ তোমার চোখের দিকে ফিরিয়ে দেয়, এ অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। কিন্তু কথাটা কঠিন, এর রহস্য আমি তোমাদের বোঝাতে পারব না।

প্রকৃতিতে পুরোপুরি সাদা আলো নেই। আমরা যত রকমের বাতি বা প্রদীপ জ্বালি, সবের শিখাতেই হলদে আভা আছে। সূর্য্যের আলোতেও লাল হলদের ভাগ খুব বেশী, নীলের

ভাগ কম। সূর্য্যের নীল চুরি করেই ত আকাশের অমন সুন্দর রঙ! উদয় ও অস্তের সময়ে সূর্য্যের কিরণকে অনেকখানি বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আসতে হয়, তাই আরও বেশী লাল্‌চে দেখায়।

নীল কিরণের কি হয়, সেটা বোঝাতে চেষ্টা করি। তোমাদের ভাল না লাগে, এটুকু বাদ দিয়ে যেও। ধর, তুমি এক নদীর পারে দাঁড়িয়ে দেখছ যে, সাঁকোর তলা দিয়ে জলের ঢেউ চলে যাচ্ছে। সাঁকোর নীচে অনেক লোহার কি কাঠের থাম। এই থাম বড় বড় ঢেউগুলোকে কিছু করতে পারছে না। তারা আপন বেগে থামের দুধার দিয়ে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু ছোট ঢেউগুলো সবাই তা করতে পারছে না। তার কতকগুলো থামে ধাক্কা খেয়ে ভেঙ্গে আরও ছোট্ট ছোট্ট হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। আলোরও এই দশা হয়। নদীর ছোট বড় সব ঢেউ মিলিয়ে যেন হল সূর্য্যের সাদা আলো। তা হলে, লাল কিরণ হল বড় ঢেউ, আর নীল কিরণ হল ছোট ঢেউ। বায়ুমণ্ডলের ধূলিকণা হল সাঁকোর খুঁটি। লাল কিরণ সেগুলোকে তুড়ী দিয়ে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে আসছে। আর নীল কিরণের অনেকগুলো ভেঙ্গে ছড়িয়ে গিয়ে আকাশ নীল করে দিচ্ছে। কুয়াসা কি ধোঁয়ার মাঝে সূর্য্য ডুবলে বেশী লাল দেখায়, কেন না তখন আলোর পথে আরও ঢের বেশী জড়-কণা থাকে।

আলোর তরঙ্গের বিষয়ে আর বেশী কিছু বলব না। ভয় হয়, পাছে তোমাদের ভাল না লাগে। এইবার তাই অন্য কথা বলি। তোমরা নিশ্চয় দেখেছ যে, দরজায় জানালায় কি ঘরের

চালে ছোট্ট ফুটো থাকলে তাই দিয়ে একটা রুপোলী রশ্মির মত রোদ এসে ঘরে ঢোকে। এই হল আলোর রশ্মি বা কিরণ। ঘরের হাওয়ায় যত ধুলো কি ধোঁয়া থাকবে, তত এই কিরণ ঝক্-ঝক্ করবে। এর উপর একটু ধোঁয়া কি এক চিমটী ধুলো ছেড়ে দেখো।

তার পর, এই আলোর রশ্মি যেখানে ঘরের মেজেতে পড়েছে সেখানে একটা আরসী রাখ। দেখবে যে, কিরণটা তাইতে লেগে ঠিকরে গিয়ে ঘরের ছাদে লাগবে। আরসীটা নাড়, ত ছাদের আলোটাও নাচতে থাকবে। এর নিয়ম হচ্ছে এই যে, আলোর কিরণ আয়নার উপর যতটা তেরচা হয়ে পড়বে, ঠিক ততটা তেরচা হয়ে বেরিয়ে যাবে।

এই রকম আলো নাচিয়ে, হরফ লিখে দূর থেকে কথা কওয়া যায়। পল্টনে, জাহাজে, আরও কত জায়গায় এই আলোর সিগ্‌নেল করে খবরাখবর নেওয়া দেওয়া হয়।

আচ্ছা, এইবার তোমার ঘরের মেজেতে এক গামলা জল রাখ। দেখবে যে, আলোক-রশ্মি জলে ঢোকবার সময়ে বেশ বেঁকে যাচ্ছে। শুধু জল কেন, কাচ ইত্যাদি যে কোন স্বচ্ছ জিনিস রাখ, তার ভেতর ঢোকবার সময়ে কিরণ বেঁকে যাবে। এটা নানা রকম পরীক্ষা করে দেখতে পার। জলে একটা লাঠির ডগা ডোবাও, মনে হবে ডগাটা যেন কে ভেঙ্গে দিলে।

একটা বাটিতে একটা পয়সা রাখ। রেখে বাটিটা এমন করে তুলে ধর, যাতে পয়সাটা আর দেখতে না পাও, ঠিক কানার আড়াল পড়ে। এখন কাউকে বল বাটিতে জল ঢালতে।

পয়সাটা তৎক্ষণাৎ দেখা যাবে। পয়সাটা থেকে তোমার চোখ পর্য্যন্ত আলোর কিরণ এখন জলের দরুন বেঁকে আসবে কি না!

আলোর কিরণ এই রকম বেঁকে যায় বলেই ত বাহিরে থেকে বোঝা যায় না জল কতটা গভীর। বোকা মানুষ এক হাত জল ভেবে পার-ঘাটে জলে নেমে পড়ল। ধুতি গেল ভিজে, সবাই লাগল হাসতে!

ঝাড়ের কলমে লেগে সাদা আলো ভেঙ্গে সাত রঙ্গ হয়ে যায়, তা তোমাদের বলেছি। কিন্তু শুধু তাই নয়। কলমের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে আলোর কিরণ অনেকটা বেঁকে যায়। প্রথম এক দফা বাঁকে কাচে ঢোকবার সময়ে, আবার এক দফা বাঁকে কাচ থেকে বেরোবার সময়ে।

এখন কলম না নিয়ে একটা গোল কাচের পরকলা নাও। একে ইংরেজীতে বলে লেন্‌স্। সাধু বাঙলায় বলে পুটক। এর গড়ন মসুরীর দালের মতন। এর উপর আলোর কিরণ পড়লে, কলমে যেমন বেঁকে যায় সেই রকম বাঁকবে। কিন্তু গোল কি না, তাই এর উপর রোদ পড়লে সব কিরণগুলো বেঁকে গিয়ে এক জায়গায় জমা হয়। সেই জায়গায় এত তাপ যে, কাগজ, কাপড়, কাঠি, যা রাখবে জ্বলে উঠবে দপ্ করে। আর সেখানে সমস্ত আলোটা জমে এমন ঝক্‌ঝকে একটা ফুটকী হয় যে, তার দিকে চাইলে চোখ ঝলসে যায়।

এই লেন্‌সের মধ্য দিয়ে যা দেখবে, বড় দেখাবে। এর দু-পিঠ যত গোল হবে, অর্থাৎ পেট যত মোটা হবে, তত এর জোর। যত চ্যাপটা হবে, তত জোর কম। যদি একটা ফাঁপা

কাচের গোলা জোগাড় করতে পার, ত তাইতে জল ভরে যা যা বলছি সব করে দেখতে পারবে।

বুড়ো বয়সে মানুষের চোখের তেজ কমে গেলে, লোকে বলে মানুষটার চাল্‌শে ধরেছে। চাল্‌শে ধরলে ডাক্তার চোখে যে চশমা পরিয়ে দেন, সেও লেন্‌স্‌ বই আর কিছু নয়।

লেন্‌স্‌ দিয়ে যে কত রকম যন্ত্র তৈরী হয়েছে তার গুনতি নেই। দূরবীণ, অণুবীণের নাম ত তোমরা জান। এ সব যন্ত্র যে, একটা কি এক রকম লেন্‌স্‌ দিয়ে তৈরী হয়, তা নয়। তবে অত কথা তোমাদের এখনই বুঝতে চেষ্টা না করাই ভাল।

যদি একটা মসুরীর দালের গড়নের লেন্‌স্‌ কাচ জোগাড় করতে পার, ত এই পরীক্ষাগুলো করে দেখো। একটা অন্ধকার ঘরে দরজা কি জানালাতে ছেঁদা করে তাইতে কাচটা পরিয়ে দাও। তার পর, এক তা সাদা কাগজ নিয়ে ঘরের ভেতর ছেঁদার সামনে ধর। দেখবে, যে সেই কাগজের উপর বাহিরের গাছ-পালা, ঘর-বাড়ী, লোক-জন, গরু-বাছুরের সুন্দর ছোট্ট একটী ছবি পড়েছে! ছবিটা উল্টো এই যা! কাগজখানা আগে পিছু করে একটা এমন জায়গা পাবে, যেখানে ছবিটা খুব স্পষ্ট হবে। এই ত হল ফটো তোলার কল। এখন ছবিখানা ধরে রাখতে হবে, এই মামলা। সেটা কি করে হয়, তা একটু ইঙ্গিতে জানাই। এমন সব ঔষধ আছে, যার উপর রোদ লাগলে, আলো লাগলে, রঙ্গ বদলে যায়। সেই রকম ঔষধ লাগান কাচ কিনতে পাওয়া যায়। সাদা কাগজের উপর তোমার ছবি না ফেলে যদি এই তৈরী কাচের উপর ফেল, ত তাতে কতকগুলো দাগ পড়বে!
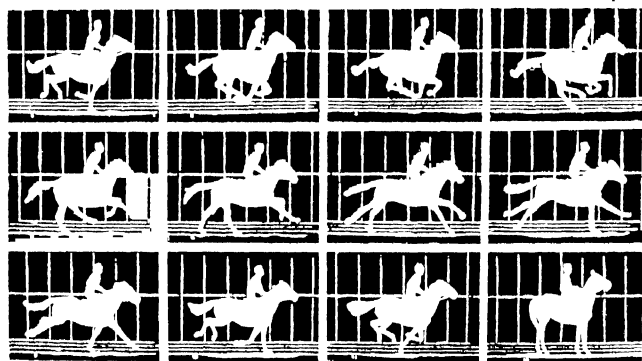
বায়োস্কোপের ছবি

তার পর সেই দাগ-পড়া কাচ অন্য একটা ঔষধে ধুয়ে নিলেই দেখবে যে, দিব্যি ছবি উঠেছে। এ ছবি আর রোদে আলোতে খারাপ হবে না, থেকে যাবে। একেই বলে ফটোগ্রাফ বা আলোক-চিত্র!

এইবার আর এক কাজ কর। ঘরের বাহিরে ছেঁদার সামনে, একটা দেশলাই-কাঠি কি পাতা, এই রকম ছোট কোন জিনিস ধর। দেখবে যে, সেই জিনিসের প্রকাণ্ড ছবি পড়েছে তোমার ঘরের দেওয়ালে। হয় ত ছবিটা ঝাপ্‌সা। একটা সাদা চাদর আগে পিছু করে ঠিক জায়গায় টাঙ্গালে বেশ পরিষ্কার ছবি পড়বে তার উপর। যদি বাহিরে দেশলাই-কাঠি না রেখে একটা স্বচ্ছ কাচের উপর আঁকা ছোট্ট ছবি ধর, ত সেই ছবি খুব বড় হয়ে তোমার পরদার উপর দেখা যাবে। আগেকার দিনে যে ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবি দেখান হত, সে এই রকম করে। এখনকার যে বায়স্কোপের ছবি, তাও এই রকমেই পরদার উপর ফেলে দেখায়।

তবে বায়স্কোপের ছবি ত জান, নড়ে, চলে, লাফায়। সেটা কি করে দেখায়, একটু বুঝিয়ে দিই। আসল কথা যে, বায়োস্কোপে ত আর একটা ছবি পরদায় ফেলে, তা নয়! অনেকগুলো ছবি খুব তাড়াতাড়ি পরে পরে দেখিয়ে যায়। তাইতে মনে হয় যেন ছবিটা জীয়ন্ত। আচ্ছা ধর, ছবিতে দেখাতে হবে যে, ঝড়ে একটা নারকেল গাছ ভেঙ্গে পড়ছে। ফটোর কল সেই গাছের সামনে সাজিয়ে ধরে, পরে পরে অনেকগুলো ছবি তুলে যায়। প্রথমটাতে গাছটা খাড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার পরেরটাতে একটু

হেলেছে, পরে আরও হেলেছে, আরও, আরও, শেষে গাছটা ভূমিসাৎ। এই ছবিগুলো যে রকমে তোলা হয়েছে, সেই রকমে একটার পর একটা খুব তাড়াতাড়ি দেখালেই মনে হবে যেন চোখের সামনে গাছ ভেঙ্গে পড়ছে। তবে, এত তাড়াতাড়ি দেখান চাই, যে বোঝা যাবে না আলাদা আলাদা ছবি।

তোমাদের সাত রঙ্গা চাকতির কথা যা বলেছিলাম, মনে আছে? তাকে লাটুর উপর এঁটে ঘোরালে সাদা দেখাবে, এই না বুঝিয়েছি? সত্যিই সাদা দেখাবে, যদি চাকতিটা খুব জোরে ঘোরাও। নইলে আলাদা আলাদা সাতটা রঙ্গ দেখা যাবে। আমাদের চোখের নিয়মই এই, যে তার ভেতর ছবিটা পড়ে সেটা তখনই মিলিয়ে যায় না, অল্প একটু ক্ষণ থাকে। তাই খুব তাড়াতাড়ি চোখের পরদায় ছবি ফেলতে পারলে সেগুলো যে আলাদা আলাদা ছবি, তা চোখ বুঝতে পারে না। একটা ঢিল সুতোয় বেঁধে খুব জোরে ঘোরালে সুতোও দেখা যায় না, ঢিলও দেখা যায় না, মনে হয় যেন একটা পাতলা কিছুর চাকতি।

এইবার তোমাদিকে মানুষের চোখের কথা বলি। মানুষের চোখ যে রকম, অনেক জন্তুরই চোখ সেই রকম। তবে মাছির মতন কোন কোন প্রাণী আছে, যার অন্য ব্যবস্থা। আমরা যে জিনিস দেখতে যাই, তার দু-চোখে দুটো ছবি পড়ে। কিন্তু মাছির চোখে এক সঙ্গে শত শত ছবি পড়ে। তাদের কাজের জন্য এইটা দরকার, তাই ভগবান তাদের এই ব্যবস্থা করেছেন।

যাক্, আমাদের চোখেরই কথা এখন বলি। চোখই মানুষের অগ্রদূত। আগে সে দেখে এত্তেলা দেবে, তার পর মাথা হুকুম করবে, এ দিকে চল কি ও দিকে চল।

চক্ষু যে কোন জিনিসের চেহারা ও রঙ্গ, দুই ধরতে পারে। শুধু তাই নয়। জিনিসটা কত বড়, কোন্ দিকে ও কত দূরে রয়েছে, তাও বুঝতে পারে। কত বড় আর কত দূরে রয়েছে, এটা ঠিক করতে হলে দুই চক্ষুরই দরকার। এক চোখ বুজে, হাত বাড়িয়ে একটা ঘটিতে জল ঢালতে চেষ্টা কর, দেখবে কত কঠিন।

মাছের চোখ নিশ্চয়ই সবাই খেয়েছ। মানুষের চোখও ঐ রকম একটা রসে ভরা গোল পদার্থ। হাড়ের কোটরের মাঝে ঢিলে করে বসান, যে দিকে ইচ্ছা ফেরান যায়। এই গোল জিনিসটার পেছন দিকে আছে এক পরদা। তার সঙ্গে শিরা দিয়ে মগজের যোগ আছে। পরদার উপর ছবি পড়লে, শিরা-গুলো তার খবর মগজকে দেয়। দেখা কাজটা এই রকমে সম্পন্ন হয়।

চোখের সামনে আছে এক পাতলা শক্ত আঁশের মতন ঢাকনী, ট্যাঁক-ঘড়ীর যে রকম কাচের ঢাকনী থাকে। এর কাজ হচ্ছে ভেতরের নরম যন্ত্রগুলোকে ঘসা-ঘসি, ধাক্কাধাক্কি থেকে যতটা সম্ভব বাঁচান। ঢাকনীর ভেতর আছে চোখের কাল তারা, আর সেই তারার মাঝখানে আছে এক ছোট ছিদ্র। এই ছিদ্র ইচ্ছামত বড় ছোট করা যায়। জোর আলোতে আপনা হতে কুঁচকে ছোট হয়ে যায়। সূর্য্যের দিকে কি আগুনের দিকে

চাইলেই বুঝতে পারবে। ছিদ্রের পেছনে আছে এক লেন্‌স্‌। এই লেন্‌স্‌ বাহিরের জিনিসের ছবি ফেলে পেছনের পরদার উপর, যেমন ফটোর কলে হয়।

পরদায় একটা হলদে ফুটকী বলে বিশেষ জায়গা আছে। সেইখানটায় ছবি ফেলতে হয় পড়াশুনা, সেলাই, ছবি আঁকা, এই রকম সূক্ষ্ম কাজ করবার সময়ে। নইলে, সচরাচর দেখার জন্য পরদার যেখানে খুসী ছবি পড়তে পারে।

তারার ছেঁদাটা যতই কেন ছোট কর না, সূর্য্যের পানে একটু চাইলেই তার পর চারি দিক অন্ধকার দেখবে। এর কারণ এই যে, অত তেজ আলোতে চোখের শিরাগুলো শ্রান্ত হয়ে যায়। একটু ক্ষণ বিশ্রাম নেয়।

এই চোখের শিরার শ্রান্তি দেখাবার একটা বেশ চমৎকার সোজা পরীক্ষা আছে। করে দেখো।

আগে তোমাদের বলা হয়েছে যে, সাতটা রঙ্গ মিলে সাদা হয়। এখন দুটো এমন রঙ্গের নাম করি, যারা এক হলে সাদা হয়ে যায়। এ দুটো হচ্ছে, লাল আর সবুজ। রোদে বসে একটা খুব ঝকঝকে লাল কাপড়ের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাক। তার পর, হঠাৎ সেটা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তোমার পরণের সাদা ধুতিটার দিকে নজর কর। ধুতিটা সুন্দর সবুজ দেখাবে। কেন, বল দেখি? তোমার চোখের শিরাগুলো লাল আলো দেখে দেখে যখন আলা হয়ে পড়েছে, তখন একটু ক্ষণ আর লাল দেখতে পারে না। তোমার ধুতির সাদা থেকে লালটা বাদ পড়লে বাকী থাকে সবুজ, শুধু সেইটে দেখবে। একটু পরে কিন্তু সবুজটা ফিকে

হয়ে হয়ে মিলিয়ে যাবে, আবার ধুতি সাদা দেখাবে। তখন চোখের শিরাগুলো বিশ্রামের পর আবার জোর পেয়েছে বুঝতে হবে।

আমার আলোর কথা শেষ করলাম। কত জিনিসই আছে বলবার ; কিন্তু তোমাদের ধৈর্য্য থাকবে না, এই আমার ভয় !

বিজলী

এইবার তোমাদের বিদ্যুৎ-শক্তির কথা বলিব। আগে হিসেব করে নাও, এ শক্তির বিষয় তোমরা কতটা জান। আস্‌মানে চড়াক্ চড়াক্ করে বিজলী চমকায়, কখন কখন সেই বিজলীর আগুন গাছে পড়ে গাছ পুড়িয়ে দেয়, কখন বা মানুষের মাথায় পড়ে তাকে মেরে ফেলে। আবার দেখ, মানুষ এই বিজলীকে আপন বাঁদী করে রেখেছে, তাকে দিয়ে কত ঘরকন্নার, সংসারের কাজ করিয়ে নিচ্ছে! বিজলীর আলো ও পাখা তোমরা অনেকেই দেখেছ। তা ছাড়া বিজলীর ইঞ্জিন হয়েছে, যা গাড়ী টানছে, বড় বড় কল চালাচ্ছে।

এত কাজ করে বটে, তবু কিন্তু এই বিদ্যুৎ একটা কিছু আজগুবি জিনিস নয়, ভূত প্রেতের মতন। প্রকৃতিতে আর পাঁচটা শক্তি যেমন আছে, এও তেমনি। অন্য শক্তি থেকে বিদ্যুৎ তৈরী হয়, আবার বিদ্যুৎ থেকে অন্য শক্তি পাওয়া যায়। আকাশে যে বিজলী চমকায় তার আলো আছে, তাপ আছে, সে ত তোমরা চোখেই দেখতে পাও। গড় গড় করে ডাকে, তাও কানে শুনতে পাও। আকাশ থেকে নেমে এসে যখন গাছ, ঘর-

বাড়ী পোড়ায়, তখন তার গতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ আছে তাও বোঝা যায়! কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, এই সব শক্তিগুলো আত্মীয় কুটুম্ব, জ্ঞাতি।

আকাশে বিজলী আসে কোথা থেকে? কোন শক্তি খরচ করে একে পাওয়া যায় সেখানে? আন্দাজ কর দেখি। বিনা মেঘে বজ্রপাত হয় কি? তা ত আর হয় না! তা হলে মেঘের সঙ্গে এর একটা যোগ আছে। মেঘগুলো যখন আস্‌মানে ছুটো-ছুটী করতে থাকে, তখন তাদেরই ঘসাঘসি, ধাক্কাধাক্কিতে এই বিজলীর জন্ম হয়।

জড়-পদার্থ ঘসে যে বিদ্যুৎ-শক্তি পাওয়া যায়, তা তোমরা একটা সহজ উপায়েই বুঝতে পারবে। একটা গালার কাঠি নিয়ে তাকে এক টুকরো কম্বল, কি ফেলানেল কাপড় দিয়ে ঘসতে থাক। একটু ক্ষণের মধ্যেই কাঠি ও কম্বল দুটোর মধ্যে বিদ্যুৎ-শক্তি এসে দেখা দেবে। তবে সে এত সামান্য বিজলী যে, তাতে চড়াক্ চড়াক্ করে আলো হবে না। অন্য এক পরীক্ষা করে বুঝতে হবে। কতকগুলো ছোট্ট ছোট্ট কাগজ-কুচি এক জায়গায় রেখে তার উপর ঐ গালা কি কম্বল যেটাই ধর, কুচিগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে তাকে কামড়ে ধরবে।

এইখানে একটা কথা তোমাদের বোঝা চাই। কথাটা একটু শক্ত। গালা ও কম্বল ঘসে দুটোর মধ্যেই বিজলীর শক্তি এল, তা তোমাদের বলেছি। কিন্তু গালার বিজলী আর কম্বলের বিজলী দুটোকে ঠিক এক রকমের শক্তি বলা যায় না। দুটোতে কাটাকাটি হয়ে যায়। দুটো মেলালে ডবল জোর না হয়ে, শূন্য

হয়ে যায়। পরীক্ষা করে দেখ। গালাও কাগজ-কুচি টানছে, কম্বলও টানছে, কিন্তু গালাতে কম্বলটা জড়িয়ে কুচোগুলোর কাছে নিয়ে গেলে তারা নড়বেও না, চড়বেও না। কি রকম হল জান? ভুঁইয়ে একটা ইট পড়ে আছে। তুমি তাকে হাতে করে তুললে, আবার নামালে; ইট যেখানকার সেখানেই রইল। তোলাটাও জোর, নামাটাও জোর, কিন্তু দুটো দুমুখো তাই কাটাকাটি হয়ে গেল। হিসেবে একটা টাকা জমার দিকেও লিখতে পার, খরচের দিকেও লিখতে পার। কিন্তু দু-দিকে লিখলেই ফল হল শূন্য।

এই যে দুই জাতীয় বিজলী, জমা আর খরচ, এরা ক্রমাগত চেষ্টা করছে মিলে যেতে। মিলে যাওয়াই এদের স্বাভাবিক অবস্থা। কোন রকমে জোর লাগিয়ে তবে এদের আলাদা করতে হয়। যেই তুমি গালা আর কম্বল ঘসলে, কি দুটো আলাদা হয়ে গেল। কিন্তু আলাদা হয়ে বেশী ক্ষণ থাকবে না। পৃথিবীর ভেতর চলে যেতে চেষ্টা করবে। নয় ত জলকণার সাহায্যে আকাশে পালিয়ে যেতে চাইবে।

একটা গালা আর এক টুকরো কম্বল ঘসে যেটুকু বিজলী হবে, তাতে কিছু আলো দেখতে পাবে না। কিন্তু এই ঘসে বিদ্যুৎ তৈরী করারই এমন কল আছে, যার থেকে বেশ লম্বা লম্বা আলোর, আগুনের ফিন্‌কী পাওয়া যায়।

কতকগুলো পদার্থ আছে, যেমন কাচ, রবার, তার ভেতর দিয়ে বিজলী পালাতে পারে না। আবার অন্য কতকগুলো দ্রব্য আছে, যেমন লোহা, তামা, তার মধ্য দিয়ে বিজলী খুব তাড়াতাড়ি আর সহজে চলে যেতে পারে। বড় বড় বাড়ীকে আকাশের

বাজ থেকে বাঁচাবার জন্য লোহার শিক লাগান থাকে, দেখেছ ত? সেই শিকের গোড়া মাটিতে, আর ডগা ছাদের খানিকটা উপরে বেরিয়ে থাকে। মাথার উপর মেঘে খুব বেশী বিদ্যুতের জোর হলে, এই উঁচু ছুঁচোল ডগাতে পড়ে তৎক্ষণাৎ মাটিতে চলে যায়। বাড়ীর কোন লোকসান হয় না।

এখন আর এক পরীক্ষার কথা বলি। একটা টাকা আর একটা ডবল পয়সা তোমার জিবের ডগার উপর-নীচে এমন-ভাবে ধর, যেন তাদের সামনের দিকটা ঠেকে থাকে। তৎক্ষণাৎ বিজলী চলবে তোমার জিবের ভেতর দিয়ে, বেশ চিন্‌-চিন্‌ করতে থাকবে। এই রকম দশ কুড়িটা টাকা আর পয়সা যদি থাক দিয়ে সাজাও, আর তাদের মাঝে মাঝে এক একটা গরম কাপড়ের চাকতি এসিড জলে ভিজিয়ে রাখ, বেশ জোরে বিজলী স্রোত বইবে। অবশ্য উপরের টাকাটা আর সব নীচের পয়সাটা তার দিয়ে যোগ করে দিতে হবে। যদি তার দিয়ে না যোগ করে উপর নীচে তোমার দুই হাত দিয়ে ছোঁও, ত শিরায় শিরায় একট ঝনঝনানি বোধ করবে।

এইটারই এক রকমারি হচ্ছে, যাকে বলে ব্যাটারী। একটা কাচের গেলাস এসিড জলে ভরে, তাইতে একটা তামার কাঠি আর একটা দস্তার কাঠি ডুবিয়ে দাও। কাঠি দুটোর ডগা জলের বাহিরে থাকবে। এই দুই ডগা যদি তার দিয়ে জুড়ে দাও ত সেই তারে বেশ জোরে বিজলী বইবে। এই রকম গোটা ছয়েক গেলাস এক সঙ্গে জুড়লে বিজলীর এত জোর হবে যে, তার ভেঙ্গে দিলে সেই ভাঙ্গা জায়গার উপর দিয়ে চড়াক করে ফিন্‌কী ছুটবে।

এই ভাঙ্গা তারের দুমুখে আছে সেই দু-রকমের বিজলী, যাকে আমি জমা আর খরচ বলেছি। ওরা আলাদা থাকতে চায় না, তাই লাফিয়ে এক হয়ে যায়। ব্যাটারীতে অনবরত এই দু-রকমের বিজলী তৈয়ের হতে থাকবে, আর তারের মধ্যে বিজলীর স্রোত বইবে।

একবার এই বিজলীর স্রোত পেলে, একে দিয়ে তুমি তোমার কত কাজ করিয়ে নিতে পার। এ তোমার ঘরে আলো দেবে, ভাত রাঁধবার তাপ জোগাবে, পম্প চালিয়ে কুয়ো থেকে জল তুলে দেবে।

ব্যাটারী অনেক রকমের হয়। টেলিগ্রাফ আপিসে যে ব্যাটারী থাকে তা তোমরা নিশ্চয় দেখেছ। বিনা এসিডের ছোট্ট ব্যাটারী এক রকম হয়, যা বাবুদের টর্চ বাতির ভেতর থাকে। তার বিজলী কয়েক ঘণ্টা চালালেই ফুরিয়ে যায়। সব রকম ব্যাটারীতেই বড় খরচ। তাই বেশী বিদ্যুতের যেখানেই দরকার, সেখানে ডাইনেমো কলে তৈরী করা হয়। এই কল বুঝতে হলে চুম্বক-শক্তির কথা জানা চাই।

চুম্বক-শক্তি বিদ্যুতের খুব নিকট আত্মীয়। চুম্বকের নাম তোমরা নিশ্চয় শুনেছ। সেই যে পুরানো গল্প আছে, সাগরের মাঝে চুম্বক পাথরের পাহাড়, তার কাছ দিয়ে এক জাহাজ যাচ্ছে। হঠাৎ সেরাঙ্গ দেখে যে, জাহাজ আর এগোতে পারছে না। কে যেন তাকে ভীষণ বেগে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সেই পাহাড়ের পানে। পাল গেল ছিঁড়ে, দাঁড় সব গেল ভেঙ্গে। শেষ জাহাজ গিয়ে আছড়ে পড়ল পাহাড়ের গায়ে। তার অঙ্গের সমস্ত লোহা, মায়

ক্ষুদ্র পেরেকটী পর্য্যন্ত, ছুটে গিয়ে চিটকে ধরলে সেই পাহাড়কে। জাহাজ চুরমার হয়ে গেল।

এ ত হল গল্প! চুম্বক পাথরের পাহাড় সত্যি আছে কি না, আমি জানি না। তবে চুম্বক লোহা অনেক দেখেছি। তারই কথা তোমাদের বলি। এর দুটী প্রধান গুণ। এক, লোহাকে টানে। তোমার ঝাঁটার ডগায় যদি একটা চুম্বক বেঁধে দাও, ত মেজের উপর ছুঁচ, পেরেক, যা কিছু পড়ে আছে সব উঠে তাইতে লাগবে। দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে, চুম্বকের মাঝখানে স্থতো বেঁধে ঝুলিয়ে দিলে সে সর্ব্বদা উত্তর দক্ষিণ মুখ করে ঝুলবে। যতই নাড়া দাও, যতই ঘুরিয়ে দাও, ফিরে দাঁড়াবে উত্তর দক্ষিণ। এই ঝোলান চুম্বকের শলাকে বলে কম্পাস। জাহাজের উপর এই দেখেই দিক্ স্থির হয়। আগেকার কালে উত্তর আকাশের ধ্রুবতারা দেখে সেরাঙ্গরা জাহাজ চালাত। মেঘলা রাতে কি কুয়াসাতে ত আর তারা দেখা যেত না! তখন দিক্-ভুল হয়ে নানা বিপদ্ ঘটত। আজকাল কোন চিন্তা নেই। জাহাজের হালের সামনেই এক কাচের বাক্সে কম্পাস আছে, দেখলেই বোঝা যায় উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম।

এখন, এই চুম্বক-লোহার সঙ্গে বিদ্যুতের সম্বন্ধটা বুঝিয়ে দিই। একটা কাটিমে বেশ করে তার জড়িয়ে, সেই তারে ব্যাটারীর বিজলী চালিয়ে দাও। কাঠিমের ছিদ্রের ভেতর একটা ইস্পাত লোহার শলা ঢুকিয়ে রাখ। খানিক পরে সেই শলাটা বার করে নিলে দেখবে যে, সেটা চুম্বক হয়ে গেছে—লোহা-চুর টেনে তুলবে, ঝুলিয়ে দিলে উত্তর দক্ষিণে দাঁড়াবে।

যদি ইস্পাতের কাঠি না ঢুকিয়ে কাঁচা লোহার কাঠি ঢুকিয়ে দাও, ত সে যত ক্ষণ বিজলীর কাঠিমের ভেতর আছে তত ক্ষণ চুম্বকের মতন সব কিছু করবে। কিন্তু বিজলী থামিয়ে দিলে, কি কাঠিটা বার করে নিলে, সে আবার যেমনকার তেমনি লোহা হয়ে যাবে।

এই হল বিজলীর জোরে চুম্বক তৈরী। এইবার চুম্বকের জোরে বিজলী তৈরীর কথা বলি। কাঠিমে তার জড়াও, কিন্তু ব্যাটারীর সঙ্গে জুড়ো না। তার পর, একটা পাকা চুম্বক নিয়ে কাঠিমে ঢুকিয়ে দাও। যেই ঢোকাবে কি তারে চড়াক্ করে একবার বিজলীর স্রোত বয়ে যাবে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে যাবে। যেই চুম্বক কাঠি টেনে বার করে নেবে, কি আবার একবার চড়াক্ করে বিজলী বইবে। কিন্তু দ্বিতীয় বারের স্রোত প্রথম বারের ঠিক উল্টো মুখে। তা হলে কি বুঝলে তোমরা, যে একটা চুম্বক ক্রমাগত ভেতর-বার করে নাড়লেই তোমার তারে অনবরত বিজলীর স্রোত বইবে, একবার এ-মুখো, একবার ও-মুখো!

আগে যে ডাইনেমো কলের কথা বলেছি সে একটু অন্য রকমের, তবু তার ফিকিরটা একই। তবে, চুম্বকটা যে নাড়ার দরকার, সেটা ফুটন্ত জলের ইঞ্জিনের জোরেও হয়, কিংবা প্রকাণ্ড জলপ্রপাত কি ঝরণার জোরেও হয়। দক্ষিণ দেশের কাবেরী নদী এক জায়গায় খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে ভীষণ বেগে ঝরণা হয়ে পড়ছে। সেই জলের তোড়ে কল বসিয়ে বিজলী তৈরী হচ্ছে। সেই বিজলী আজ কত শহরকে আলো, পাখা জোগাচ্ছে।

জলপ্রপাত

চুম্বকের আর একটা গুণ তোমাদের জানা উচিত। চুম্বক ঝোলালে তার এক মুখ উত্তরে, আর এক মুখ দক্ষিণে ফিরে থাকবেই। এ কথা ত বলেছি। কিন্তু দুটো চুম্বক পাশাপাশি ঝোলাও, এক মজা দেখবে। একটার উত্তর অন্যটার উত্তরকে দূরে ঠেলে দিয়ে দক্ষিণকে কাছে টেনে নেবে। দুটো সমান জোরের চুম্বক যদি এই রকম করে জোড়া হয় (অর্থাৎ একটার উত্তরের সঙ্গে আর একটার দক্ষিণ), তা হলে দুটোর চুম্বক-শক্তি কাটাকাটি হয়ে যাবে। কোন মুখেই আর লোহা টানবে না। চুম্বকের নিজের দেহের মধ্যেও, দেখ, এই ব্যাপার! দু দিকের ডগায় বেশ জোর, কিন্তু যত মাঝের পানে আসবে, তত জোর কম। শেষ, একেবারে মাঝখানটায় উত্তর দক্ষিণ শক্তি কাটাকাটি হয়ে গেছে, কোন জোরই নেই।

বিদ্যুতের দু রকম শক্তির যেমন জমা খরচ হওয়ার কথা বলেছি, এও যেন সেই রকম। আর একটা কথা বলি, তোমরা আশ্চর্য্য হয়ো না। চুম্বক উত্তর দক্ষিণে দাঁড়ায় কেন, তা জান? আমাদের এই পৃথিবী একটা প্রকাণ্ড চুম্বক বলে। দুই মেরুতে তার দুই ডগা।

এই যে এত দূরে দূরে টেলিগ্রাফের খবর পাঠান হয়, এও বিজলী আর চুম্বক শক্তির জোরে। তোমাদিকে মোটামুটি বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করি, কি করে এটা হয়। আচ্ছা মনে আছে ত, যে এক তার জড়ান কাঠিমের ভেতর কাঁচা লোহার শলা পুরে রেখে, তারে ব্যাটারীর বিজলীর স্রোত চালালে লোহাটা চুম্বকের কাজ করে! ধর, শলাটার এক মুখের কাছে একটা লোহার চাকতি ঝোলান আছে। শলাটা চুম্বক হলেই খট্ করে

চাকতিকে টেনে নেবে। বিজলী থামালেই আবার ছেড়ে দেবে তারের মাঝে কোথাও একটা স্থইচ্ বা টিপ-কল থাকলে তুমি ইচ্ছামত বিজলী চালাতে থামাতে পারবে। এই রকম কল টিপে লোহার চাকতিটা দিয়ে কট্-কটা-কট্ আওয়াজ করা যাবে। এই যে আওয়াজ, এটা তোমার ঘরেও করতে পার, পাশের ঘরেও করতে পার, পাঁচশো ক্রোশ দূরেও করতে পার। শুধু তারটা লম্বা করার মামলা! বিজলী ত আর চলতে কাতর নয়! আগের থেকে এই কট্-কটা-কট্ শব্দের একটা মানে যদি ঠিক করে রাখ, তা হলে তোমার টিপ-কল টিপে যত দূরে ইচ্ছা খবর দিতে নিতে পারবে। এই হল তোমার তারের খবরের হিকমৎ।

ইদানীং আবার বিনা তারে বিজলী চালাবার বুদ্ধি বেরিয়েছে। পণ্ডিতেরা নানা পরীক্ষা করে জানতে পারলেন যে, ইথারের তরঙ্গ তুলে বিজলীকেও আলোর মতন শূন্য-পথে চালাতে পারা যায়। তখন এমন কল তৈরী হল, যাতে করে বিনা তারে বিজলীর ঢেউ তুলে যত দূরে মরজী টেলিগ্রাফের কট্-কটা-কট্ করা যেতে পারে। এই হল আজকালকার বে-তার খবর। শুধু তাই নয়, আজ আকাশে ঢেউ তুলে গলার আওয়াজ, গান বাজনা, কত দূরে দূরে শোনা যাচ্ছে। একে বলে রেডিও। কলকাতায় গেলে দেখতে পাবে, কত দোকানে বসে লোকে এই বিনা তারের যন্ত্রে গান, বাজনা, বক্তৃতা শুনছে।

তাহলে একবার শক্তির বাহনগুলো ফের মনে করে নাও। শব্দ চলে জড়-কণা মারফতে। আলো চলে ইথারের পথে। তাপ জড়-কণা কাঁপিয়েও এগোয়, আবার আলোর মতন ইথারে

ঢেউ তুলেও এগোয়। বিজলীর স্রোত তার দিয়ে যায়, বিজলীর ঢেউ ইথার দিয়ে যায়।

বিদ্যুৎ-শক্তি এমন আশ্চর্য্য জিনিস, এর সম্বন্ধে এত নূতন কথা রোজ বেরোচ্ছে, যে এর গল্প ফুরায় না। তবে সব কথা এ রকম লিখে ত বোঝান যায় না। তাই নিতান্ত অনিচ্ছায় আমি থামলাম।

একটা কথা শুধু বলে রাখছি এইখানে। একটু পরে কাজে লাগবে। তোমাদিগকে অণুর কথা, জড়-কণার কথা আগেই নানা জায়গায় বলেছি। দুনিয়াতে যত পদার্থ আছে, সবই অতি ক্ষুদ্র কণা দিয়ে তৈরী। এই কণার নাম আমাদের সাবেক কালে দেওয়া হয়েছিল পরমাণু। আগে লোকে মনে করত, জড়ের এই যে পরমাণু, একে আর ভাগ করা যায় না। কিন্তু এখন বোঝা গেছে যে, এই প্রত্যেকটী কণা এক একটী সূর্য্য-মণ্ডলের মতন। ঠিক মাঝখানে এক সূর্য্য আছে আর তার চারিদিকে ঘুরছে গ্রহেরা। তোমাদিকে যে দু রকমের বিজলী-তেজের কথা বলেছি, মনে আছে ত, যারা মিললে কাটাকাটি হয়ে যায়, শূন্য হয়ে যায়? তারই এক রকম তেজ এই সূর্য্যে আছে, আর অন্য রকম তার গ্রহের মধ্যে আছে। এই হল জড়ের পরমাণু।

পদার্থে আর শক্তিতে মিলে খেলা, এই অতি ছোট্ট পরমাণু থেকে আরম্ভ করে অনন্ত বিশাল মহাশূন্য পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্র অহরহ চলেছে। এর সব রহস্য মানুষ কোন দিন জানবে না। তবে একটা কথা তোমরা বুঝে রেখো। জমা খরচ ঠিক আছে। শক্তি কি পদার্থ, কারোই ক্ষয় নেই।

অণু-পরমাণুর খেলা—রসায়ন

এইবার তোমাদিকে পদার্থের ভেতরের কথা একটু বলব। ভেতর দিক্ থেকে দেখতে গেলে পদার্থ দু রকমের হয়—যৌগিক আর মৌলিক। যৌগিক মানে যে জিনিস দু তিনটে আলাদা আলাদা পদার্থ মিলিয়ে তৈরী, আর মৌলিক মানে যে জিনিসে এক বই দ্বিতীয় পদার্থ নেই।

লোহাতে মরচে পড়ে, এ ত সকলেই জান। আচ্ছা, এই মরচে যদি চেঁচে নিয়ে আলাদা কর, ত দেখবে এ একটা লালচে গুঁড়ো, লোহার সঙ্গে এর কোনও সাদৃশ্য নেই। এই মরচে হচ্ছে যৌগিক পদার্থ, কেন না এর ভেতর লোহাও আছে অক্সিজেনও আছে। কিন্তু লোহাও আর লোহা অবস্থায় নেই, অক্সিজেনও আর অক্সিজেন অবস্থায় নেই। দুটো মিলে এক নূতন দ্রব্যের সৃষ্টি করেছে।

হিঙ্গুল বা সিন্দুর মনে আছে? যা তাতালে অক্সিজেন বেরিয়ে যায়, পারা পড়ে থাকে। সেও এক যৌগিক পদার্থ, পারা আর অক্সিজেন মিলে তৈরী হয়েছে। তার সঙ্গে পারার কি অক্সিজেনের কোন চেহারার সাদৃশ্য নেই। সম্পূর্ণ নূতন দ্রব্য।

জল আর এক যৌগিক পদার্থ। হাইড্রজেন বলে এক গ্যাসকে পোড়ালেই, অর্থাৎ অক্সিজেন খাওয়ালেই, এর জন্ম হয়।

গাছের কথা বলবার সময়ে গাছের পাতার সবুজ রস, তার দেহের 'স্যাপ' রস, এই সবের যে নাম করেছি, মনে আছে ত? এ সব যৌগিক পদার্থ। তেমনি মানুষের রক্ত, মাংস, হাড়, এরাও যৌগিক পদার্থ। জগতে তোমাদের চারিদিকে যে যে দ্রব্য দেখছ, কাঠ, মাটি, পাথর ইত্যাদি তারও অধিকাংশ যৌগিক পদার্থ।

তবে সময়ে সময়ে এমন হয়, যে দুটো পদার্থ একত্র রয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে কোন অন্তরের যোগ হয় নেই। যেমন ধর, আমাদের বায়ুমণ্ডল। তোমরা জান যে এতে অক্সিজেন, নাইট্রজেন, জলের ভাপ ও কয়লার ধোঁয়া আছে। আছে এরা সবাই, কিন্তু এদের সত্যি যোগ হয় নেই, একত্র বাস করছে মাত্র। একটু চেষ্টা করলেই সবগুলোকে পৃথক্ পৃথক্ করে ফেলা যায়। এ কি রকম জান? যেমন বালি আর নুন। দুটো এক সঙ্গে খুব নেড়ে চেড়ে গাদা-বন্দি করে রাখ। কিন্তু বালি বালিই থাকবে, নুন নুনই থাকবে। তার উপর জল ঢেলে দিলেই বুঝতে পারবে।

আর এক রকমে দুটো জিনিস মিলে মিশে থাকতে পারে। যেমন জল আর চিনি, জল আর নুন, ইস্পিরিট আর গালা। চিনি গলে গিয়ে এমন মিশে যায় জলের সঙ্গে, যে শরবতের যত ছোট কণাই তুমি নাও, সেটা মিষ্টি হবে। নোনা জলেরও তাই।

বার্ণিশেরও তাই। কিন্তু তাই বলে শরবৎ, কি নোনা জল, কি বার্ণিশ, নূতন পদার্থ কেউ নয়। জল কি স্পিরিট শুকিয়ে গেলেই পড়ে থাকে চিনি, নুন, গালা।

তা হলে বুঝলে, যে দুটো পদার্থ বালি-নুনের মতন মিশে একত্র থাকতে পারে, জল-চিনির মতন মিশে থাকতে পারে; আবার মরচের লোহা-অক্সিজেনের মতন মিশে থাকতে পারে।

মৌলিক পদার্থের সব চেয়ে ছোট কণাকে পরমাণু বলে। যৌগিক পদার্থের কণাকে অণু বলে, পরমাণু নয়। কেন না যৌগিক কণার ভেতর অনেক পরমাণু আছে। শরবতের কণা অণুও নয়, পরমাণুও নয়; কেন না তার ভেতর জল ও চিনির অণু পাশাপাশি রয়েছে। বালি ও নুন ত সে হিসেবে মেশেই না। অণুবীণ দিয়ে দেখলেই বালির কণা আর নুনের কণা আলাদা নজরে পড়বে।

এই অণু পরমাণুকে ত আর কেউ চোখে দেখে নেই। পরমাণুর ভেতরে যে দুই বিজলী শক্তি খেলা করছে, তাও কেউ কখন দেখতে পায় নেই। অণুর ভেতর পরমাণুগুলো কি ভাবে সাজান আছে, তাও চোখে দেখা যায় না। তবে পণ্ডিতেরা নানা রকম হিসেব করে একটা আন্দাজ করেছেন যে অণু পরমাণু কি ভাবে রয়েছে, কি রীতিতে কাজ করছে। কিন্তু এ সব কথা বোঝা তোমাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। একটা উদাহরণ দিই, যার থেকে কতকটা ধারণা হবে।

উপরে বলেছি যে, হাইড্রজেন অক্সিজেন মিলে জল হয়। এর মানে যে, জলের প্রত্যেক অণুতে এই দুই মৌলিক পদার্থের

পরমাণু আছে। কটা করে আছে? পণ্ডিতেরা বলেন, ছুটো হাইড্রোজেন আর একটা অক্সিজেন। এ কথা তাঁরা কি করে জানলেন, দেখা যাক্। একটা পরীক্ষার কথা বুঝিয়ে বলি। এটা তোমরা নিজে পরখ করে দেখতে পারবে না। যন্ত্র-পাতি চাই। তবে যা লিখছি মন দিয়ে পড়লে হয়ত বুঝবে।

ব্যাটারী যন্ত্রটা মনে আছে ত? তার ছুটো মুখ যদি জলে ডোবাও, ত জলের ভেতর দিয়ে বিজলীর স্রোত বইবে। এই বিজলীর তেজে জলের অণু ভেঙে ছু ভাগ হয়ে যায়। তুমি দেখবে যে, তোমার তারের ছু মুখ থেকে বুড়-বুড় করে গ্যাস বেরোচ্ছে। তার একটা হাইড্রজেন, একটা অক্সিজেন। এই ছুই গ্যাস যদি একটুও পালাতে না দেওয়া হয়, সবটা যদি ধরা যায় ত দেখতে পাবে যে, অক্সিজেন যতটা বেরোচ্ছে, হাইড্রজেন তার ছুই গুণ বেরোচ্ছে। ওজনে নয়, মাপে! অর্থাৎ **অ** যদি বেরোয় এক পাঁট, ত **হা** বেরোবে ছু পাঁট ; **অ** যদি বেরোয় ছু পাঁট, তাহলে **হা** বেরোবে চার পাঁট, এই রকম। তা হলেই স্থির হল ত, যে জলের মধ্যে যত **অ** পরমাণু আছে তার ডবল **হা** পরমাণু আছে। পণ্ডিতরা তাই জলের নাম দিয়েছিলেন **হা** $_2$ **অ**।

এইবার ওজনের দিক দিয়ে দেখ। এই ছুই গ্যাসকে সোজাসুজি ওজন করে দেখা গেছে, **হা**'র চেয়ে **অ** যোলগুণ ভারী। আচ্ছা, যোল রতি ওজন **অ** নাও, আর ছুই রতি ওজন **হা** নাও। ছুটোকে এক পাত্রে বন্ধ রেখে তার ভেতর বিজলীর ফিনকী চালাও। ছুম্ করে আওয়াজ হয়ে ছুটো গ্যাস মিলে

যাবে। তোমার পাত্রের মধ্যে থাকবে শুধু জলের ভাপ। ওজন করলে দেখতে পাবে, যে সেই ভাপ ঠিক আঠার রতি। হিসেবটা আবার বুঝে নাও। দুই রতি ওজন হাইড্রজেন নিয়েছিলাম আর যোল রতি ওজন অক্সিজেন নিয়েছিলাম। তাই থেকে পেলাম যোল আর দুইয়ে আঠার রতি জল, অর্থাৎ হা$_2$ অ।

তা হলে, হাইড্রজেন তার আটগুণ ওজনের অক্সিজেন খেয়ে ফেলে। খাওয়ার ফলে হয় জল। এই যে হিসেব, এর নড়চড় হওয়ার যো নেই। যখন যেখানে জল নিয়ে তার ভেতর ব্যাটারীর বিজলী চালিয়ে পরখ করবে, এই হিসেব মত হা ও অ পাবে।

এইখানে একটা কথা মনে করে দিই। যে বিজলী জলকে ভেঙ্গে দু ভাগ করে দিলে, সেই বিজলীই আবার দু ভাগকে জোড়া দিয়ে ফের জল তৈরী করলে। এটা মনে রাখবার মত কথা।

জলের বিষয় যা বললাম, অন্য যৌগিক পদার্থের বেলাও সেই কথা খাটে। ধর, কয়লা-পোড়া ধোঁয়া। তার ভেতর ওজন হিসেবে কতটা কয়লা, কতটা অক্সিজেন আছে, তা একেবারে স্থির। নড়চড় হবে না। তেমনি কটা পরমাণু কয়লা কটা পরমাণু অক্সিজেন খেয়ে এই পদার্থের সৃষ্টি করে, তাও স্থির। পণ্ডিতেরা এই পদার্থের নাম দিয়েছেন ক অ$_2$। মানে হল, অক্সিজেনের দুই পরমাণু কয়লার এক পরমাণুর সঙ্গে মিশে আছে এই ধোঁয়াতে।

এ সম্বন্ধে তোমাদিকে আর বেশী কিছু বলব না। ইচ্ছা হলে, পরে বড় বই পড়ে দেখো। এই যে বিদ্যা, এর পুরানো নাম

রসায়ন। পরীক্ষা করে না দেখিয়ে, শুধু কথায় রসায়ন শেখান অসাধ্য কাজ। কতকগুলো আজগুবি নূতন নাম বলে তোমাদের মাথা গুলিয়ে দিয়েও কোন উপকার হবে না। আর দেখছ ত, সঙ্কেত-চিহ্ন ছাড়া রসায়নের কথা চালান কত কঠিন। তাই তোমাদের চেনা জানা কয়েকটা দ্রব্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে দুচার কথা বলা ছাড়া আমার উপায় নেই।

মৌলিক পদার্থ সব সুদ্ধ বিরানব্বইটা জানা আছে। তবে ক্রমশঃ আরও যে কত বেরোবে তা কেউ বলতে পারে না। আমার ছেলেবেলাতে ষাট সত্তরটার বেশী জানা ছিল না।

যৌগিক পদার্থ অসংখ্য। আগেই বলেছি যে, চারিদিকে যা কিছু দেখছ, তার অধিকাংশই যৌগিক।

যৌগিক পদার্থের অনেকগুলোই ধাতু। তার মধ্যে কয়েকটা তোমাদের চেনা জিনিস। যেমন—সোনা, রূপো, তামা, পারা, দস্তা, শীষে, রাঙ্গতা, লোহা, নিকেল, এলুমিনিয়ম। এলুমিনিয়ম সাদা রঙের, আর খুব হালকা। আজকাল এই ধাতুর বাসন-কোসনের খুব চলন হয়েছে। আর এখন যে সিকি, দুয়ানি, আনির চলন হয়েছে সেগুলো নিকেলের তৈরী। পেতল ও কাঁসা দু তিনটে ধাতু মিশিয়ে তৈরী হয়। লোহাকে কয়লা খাইয়ে, পান দিয়ে ইস্পাত তৈরী হয়। টিনের চাদর হচ্ছে লোহার উপর রাঙ্গতা ঢাকা। বালতীর টিন, ঘরের চালের টিন, লোহার উপর দস্তা ঢাকা চাদর।

অন্য অনেক ধাতু আছে, যা তোমরা দেখ নেই। হয় ত কখন দেখবেও না। কিন্তু তাদের অনেকগুলোর আবার যৌগিক

পদার্থ তোমাদের জানা জিনিস। এই কলিযুগটা ত কলের যুগ! ধাতু না হলে কল হয় না। তাই নানা রকমের মাটি পাথর থেকে ধাতু বার করা, দু তিনটে ধাতু মিশিয়ে রকম রকমের মিশ্র ধাতু তৈরী করা, এই নিয়ে লোকে যে কত পরিশ্রম করছে, কত টাকা খরচ করছে, তার ইয়ত্তা নেই। জামশেদপুরের লোহার কারখানার নাম তোমরা নিশ্চয় শুনেছ। লাখো লোক সেখানে দিবারাত্র খাটছে। লোহা-ইস্পাতের কত কি গড়ছে!

অ-ধাতু, মানে যা ধাতু নয়, এই জাতীয় মৌলিক পদার্থের মধ্যে তোমাদের পরিচিত কয়েকটা পদার্থের নাম করি। হাইড্রজেন, অক্সিজেন, নাইট্রজেনের নাম ত শিখেইছ! তা ছাড়া কয়লা, গন্ধক ত রোজ দেখছ। তার পর, আয়োডিন—কোথাও চোট লাগলে ডাক্তার বাবু যা লাগিয়ে দেন, সে আর এক মৌলিক পদার্থ। ইস্পিরিটে গলিয়ে ডাক্তারখানায় রাখা থাকে। এই আয়োডিনের এক নিকট আত্মীয় আছে, নাম ক্লোরিন। তাকেও বোধ হয় দেখেছ। রাঁধতে রাঁধতে উনোনে নুন পড়লে যে বদ-গন্ধ হলদে ধোঁয়া ওড়ে, গলায় গেলে কাসি আসে, চোখে ঢুকলে চোখ জ্বালা করে, সেই ক্লোরিন। এই পদার্থ মানুষের অনেক উপকারে লাগে। এর এক ক্ষমতা আছে ময়লা সাফ করার। তাই মড়কের সময়ে এই দিয়ে খাবার জল শুদ্ধ করে নেওয়া হয়। আবার, বড় বড় কাপড়-ধোলাইয়ের কারখানাতে ক্লোরিন দিয়ে ধুয়ে কাপড় ধবধবে সাদা করা হয়। এ সব ত গেল এর ভাল দিক্‌টা। একটা মন্দ দিক্‌ও আছে। গেল জার্ম্মান যুদ্ধের সময়ে এই গ্যাস বহু লোকের সর্ব্বনাশ করেছিল।

ইংরেজ, জার্মান, দু দলই যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের গরীব মাইনেখোর সেপাইদের উপর এই গ্যাস ছেড়েছিল। তাতে সে বেচারাদের অনেকের চোখ, নাক, গলা চিরজীবনের জন্য জখম হয়ে গেছল।

ফস্‌ফরাসের নাম শুনেছ কি? সেও এক মৌলিক পদার্থ। প্রধানতঃ লাল দেশালাই তৈরীর কাজে লাগে। ফস্‌ফরাস্ হাওয়াতে খোলা রাখবার যো নেই। আপনা হতে অক্সিজেন খেয়ে ছাই হয়ে যায়। কোন রকম ঘসা কি ধাক্কা পেলে দপ্ করে জ্বলে ওঠে। এই জিনিস অন্য পদার্থের সঙ্গে মিশে জীব-জন্তুর হাড়ে অনেক থাকে। তাই হাড় পুড়িয়ে ছাই করে নিলে, সেই ছাই চাষের জমীতে উৎকৃষ্ট ফস্‌ফরাসের সারের কাজ করে।

কয়লারই আর এক রূপ হীরা। কথাটা খুব আশ্চর্য্য হলেও, একেবারে সত্যি। কয়লা থেকে হীরা তৈরীও হচ্ছে। তবে সে হীরা ছোট ছোট, কাচ কাটার কাজে ব্যবহার হয় মাত্র। গয়নায় লাগাবার জন্য যে রকম হীরা দরকার হয়, তা কয়লা থেকে তৈরী করতে খরচ অসম্ভব রকম পড়বে। তাই আজও খনির হীরার কদর কমে নেই।

হীরার চেয়ে ঢের বেশী দরকারী একটা জিনিসের নাম করি, মনে রেখো—সিলিকন। এ পদার্থকে তোমরা দেখ নেই বটে, কিন্তু একে অক্সিজেন খাওয়ালে যে পদার্থ তৈরী হয়, তাকে খুব চেন। তার নাম বালি। এই বালি কত কাজেই না লাগে! বালি না হলে এই সব বড় বড় ইমারৎ উঠত কি?

এইবার যৌগিক পদার্থের কথা সামান্য কিছু বলব। এসিডের নাম তোমাদের কাছে বহুবার করেছি। এসিড নানা রকমের

হয়। গন্ধক কি সোরার এসিড, যাকে চলিত কথায় তেজাব বলে, সে অতি ভয়ানক জিনিস। গায়ে পড়লে গা পুড়ে যায়, কাপড়ে পড়লে কাপড় জলে যায়। লোহা, তামা, রুপো, দস্তা, তাতে যে ধাতু ফেলে দেবে (এক সোনা ছাড়া), তাকে গলিয়ে খেয়ে ফেলবে। অন্য দিকে আবার দই, নেবুর রস, তেঁতুলের রসের মতন অতি নরম এসিড আছে, যা মানুষে অবাধে খাচ্ছে। এসিড কথাটার মানে টক। মানুষের নাক মুখ থেকে যে প্রশ্বাস বেরোচ্ছে, সেটাও একটা এসিড। তাকে কয়লার এসিড বলতে পার! পণ্ডিতেরা তার নাম দিয়েছেন **ক অ$_2$**। এর কথা তোমাদিকে আগে বলেছি। চা-খড়ি, সোডা, পটাশ এরা সব এই এসিডের নিকট-কুটুম্ব। জলে এই এসিড খাইয়ে সোডা-ওয়াটার হয়।

সব এসিডের মধ্যেই হাইড্রজেন আছে, এইটে মনে রেখো। আর এই হাইড্রজেনকে ফেলে দিয়ে কোন ধাতুকে তার জায়গায় বসাবার জন্য এসিড সদাই প্রস্তুত। এসিডের হাইড্রজেন বেরিয়ে গিয়ে তার জায়গা যখন কোন ধাতু দখল করে বসে, তখন তাকে লবণ বা নুন বলে। আমাদের খাবার নুনও এই জাতীয় পদার্থ।

এটা তোমাদিকে পণ্ডিতী ভাষায় বুঝিয়ে দিই। হাইড্রজেন আর ক্লোরিন মিলে যে এসিড হয়, তার নাম **হা ক্লো**। নাম থেকে বুঝতে পারছ ত, হাইড্রজেন আর ক্লোরিনের এক এক পরমাণু মিলে এই এসিডের এক অণু তৈরী হয়! এখন, হাইড্রজেনের পরমাণু বেরিয়ে গিয়ে তার জায়গায় যখন সোডিয়ম ধাতুর এক পরমাণু এসে বসে, তখন যে পদার্থ জন্মায়, তার

নাম **সো ক্লো**। এই আমাদের নিত্যকার খাবার নুন। বুঝলে ?

এসিডে হাইড্রজেনের জায়গা কোন ধাতু এসে দখল করলে হাইড্রজেনটা বেরিয়ে যায়, এ তোমরা একটু জোগাড়-যন্ত্র করলে পরখ করে দেখতে পার। একটা বড়-মুখওয়ালা বোতলে খানিকটে গন্ধকের তেজাব নিয়ে, তাইতে গোটা-কয়েক ছোট ছোট তামার টুকরো ফেলে দাও। দেখবে, যে একটা গ্যাস বুড়-বুড় করে বেরোচ্ছে। এই গ্যাস হচ্ছে হাইড্রজেন। তাকে ঠেলে বার করে দিয়ে তার জায়গা জুড়ে বসছে তামা। কি করে জানা যাবে যে, এটা হাইড্রজেন ? বোতলে ছিপি এঁটে তাইতে একটা সরু মুখের নল পরিয়ে দাও। গ্যাসটা সোঁ-সোঁ করে বেরোতে থাকবে নল দিয়ে। দেশলাই ধরিয়ে দাও, দিব্যি জ্বলবে। কিন্তু সে আগুন লেশমাত্র আলো দেবে না, কারণ তাতে কয়লার সম্পর্ক নেই। তার থেকে যে ধোঁয়া উঠবে সেটা জলের ভাপ বই আর কিছুই না। হাইড্রজেন জ্বলছে মানে, বাতাসের অক্সিজেন খেয়ে খেয়ে জল হয়ে যাচ্ছে। আগুনের শীষের উপর একটা ঠাণ্ডা বাটি ধর। বাটিতে ভুসো পড়বে না, ছোট ছোট জলের বিন্দু জমবে। বোতলে যে পদার্থটা পড়ে থাকবে সেটা সুন্দর নীল জল। তাকে শুকিয়ে নিলেই পাবে তুঁতের দানা। তুঁতে তা হলে হল ত গন্ধক এসিডের তামার লবণ! ইংরেজী নাম **Copper-Sulphate**।

তোমরা নিত্য-জীবনে নানা রকম লবণ দেখ। চা-খড়ি, সোডা, পটাশ, এরা হল কয়লা এসিডের লবণ। সোরা হল সোরার

তেজাবের লবণ। তুঁতের কথা ত বললাম। ফটকিরিও এক লবণ। ওতে আছে এলুমিনিয়ম ধাতু আর গন্ধকের এসিড।

গন্ধক, কয়লা, ফস্‌ফরাস্‌, নাইট্রজেন ইত্যাদি অনেকগুলো অ-ধাতুকে অক্সিজেন খাওয়ালে এসিড হয়। ধাতুগুলোকে অক্সিজেন খাওয়ালে হয় ক্ষার। আমাদের রোজকার পরিচিত ক্ষার হচ্ছে চুন। তা ছাড়া, সোডা-ক্ষার, পটাশ-ক্ষার আরও নানা রকম ক্ষার আছে যা আমাদের অনেক কাজে লাগে। এই ক্ষারগুলোর প্রধান ব্যবহার হচ্ছে সাবান তৈরী করাতে। চর্ব্বী কি তেলের সঙ্গে ক্ষার ফুটিয়ে সাবান তৈরী হয়।

আচ্ছা, এমোনিয়ার নাম ভুলে গেছ, না মনে আছে? যে জিনিস মাথা ধরলে শুঁকতে বলেছিলাম! নিশাদল আর চুন মেশালে এই এমোনিয়া গ্যাস বেরোয়। তাকে জলে গুললেই হল এমোনিয়া ক্ষার। এমোনিয়া দিয়ে খুব ভাল কাপড় ধোয়া যায়। তা ছাড়া এই ক্ষার চুনের জলের মতনই, খুব ভাল ঔষধ।

তেল চর্ব্বী বলতে মনে পড়ল যে, এক জাতীয় যৌগিক পদার্থ জগতে সব চেয়ে বেশী আছে। তেল চর্ব্বী তারই সামিল। সেগুলো মোটামুটি অঙ্গারের সঙ্গে হাইড্রজেন, অক্সিজেন, নাইট্রজেন যোগে জন্মেছে। এই পদার্থগুলোর মধ্যে আবার বেশীর ভাগ পদার্থ প্রাণীর ও উদ্ভিদের দেহ থেকে পাওয়া যায়। কেরাসিন তেল, পাথুরে কয়লা, মোটরের পেট্রল এ সব খনি থেকে তোলা হয় বটে; কিন্তু তারাও ত বহু যুগ আগের মাটি-চাপা গাছ-পালা বই আর কিছু নয়। কলকাতার রাস্তায় যে গ্যাস জ্বলে সেও এই জাতীয়। ইস্পিরিটও এই জাতীয়। আমাদের

সব খাবার জিনিস (নুন আর জল ছাড়া), মাছ-মাংস, তরী-তরকারী, ভাত-দাল, তেল-ঘি, গম-যব, চিনি-গুড়, দুধ-দই সব অঙ্গারের যৌগিক পদার্থ। কোন খাবার কতখানি খাওয়া উচিত, কি খেলে শরীরের কোন অংশের পুষ্টি হয়, এ জানা নিতান্ত দরকার। ডাক্তারদের তাই রসায়ন খুব ভাল করে শিখতে হয়।

অক্সিজেনের কথা তোমাদিকে গোড়া থেকেই বলে আসছি। এই গ্যাস যে আমাদের প্রাণ-বায়ু, তা মনে আছে ত? এই গ্যাসের মতন সর্ব্বব্যাপী পদার্থ আর নেই। জলে, স্থলে, আকাশে যে যে পদার্থ আছে, তার হিসেব করলে বোঝা যাবে যে, অক্সিজেনের ভাগ জগতে কত বেশী! কয়লার চেয়েও বেশী! এ যে শুধু প্রাণী-উদ্ভিদের শ্বাস-প্রশ্বাসের সাহায্য করছে, তা নয়। এর মত ঝাড়ুদারও দুনিয়াতে কেউ নেই। যেখানে নোঙরা জিনিস, যেখানে ময়লা, সেখানেই দেখবে, আমাদের এই বন্ধু তাকে সাফ করছে। সাফ করছে, মানে ধাঙড়দের মতন এক দিকের ময়লা ঝেঁটিয়ে আর এক দিকে জমা করছে, তা নয়। তাকে পুড়িয়ে মেরে দিচ্ছে।

তোমাদিকে এসিডের কথা বলেছি, যে তারা তাদের হাইড্রজেনটাকে ফেলে দেওয়ার জন্য সদাই ব্যগ্র। তেমনি কতকগুলো লবণ আছে, যারা নিজের দেহের খানিকটা অক্সিজেন ছেড়ে দেওয়ার জন্য ছুতো খুঁজে বেড়াচ্ছে। আর এই যে তাজা অক্সিজেন, যা অন্য যৌগিক পদার্থের দেহ থেকে বেরিয়ে আসে, এর খুব তেজ। অর্থাৎ অন্য জিনিসকে পুড়িয়ে দেবার এর খুব

আগ্রহ। এই রকম একটা লবণ হচ্ছে পারমেঙ্গেনেট্। নাম শুনে ঘেবড়ে যেও না। এ তোমাদের জানা জিনিস। গ্রামে কিছু রোগ এলে সরকারী ডাক্তারেরা কুয়োতে, পুকুরে, নালাতে যে বেগুনী রঙের গুঁড়ো ঢালেন, এ সেই পদার্থ। জলে পড়লেই এর বাড়তি অক্সিজেনটা বেরিয়ে গিয়ে জলের সব ময়লা পুড়িয়ে দেয়। এক গেলাস পুকুরের জলে দুই একটা দানা ছেড়ে দিয়ে দেখো, দিব্যি সুন্দর বেগুনী জল তৈরী হবে। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা যেতে না যেতেই জলটার রঙ বদলে যাবে। সব ময়লা পুড়ে গিয়ে জলের রঙ হয়ে যাবে পাটকিলে।

এই রকম আর এক লবণ হচ্ছে সোরা। সোরার এত কদরই ত এই জন্য। গন্ধক, কয়লার গুঁড়ো ও লোহা-চুর, সোরার সঙ্গে মিশিয়ে বারুদ হয়, তা জান ত? কয়লা ও গন্ধক হাওয়াতে পোড়ে, কিন্তু আস্তে আস্তে। লোহাচুর হাওয়াতে আদবে পোড়ে না, কিন্তু অক্সিজেনে জলে। কিন্তু বারুদে আগুন দিলেই যেই সোরা অক্সিজেন ছাড়লে, কি অমনি লোহাচুরে আগুন ধরল, গন্ধক কয়লা ধু ধু করে জলে উঠল। ধু ধু করে জলে ওঠা মানে ত হঠাৎ অনেক খানা গরম ধোঁয়া বেরোন! এই ধোঁয়ার ঠেলাই হচ্ছে বারুদের জোর। এরই জোরে বন্দুকের গুলি শন্-শন্ করে, দেখতে না দেখতে, কত দূরে গিয়ে পড়ে! এর জন্য দায়ী সোরার অক্সিজেন, তা বুঝছ ত?

ভুঁই-পটকা জান? ভুঁইয়ে আছাড় দিলে, খুব আওয়াজ করে ফেটে যায়। তার ভেতর সোরা থাকে না, তবে কোলরেটো পটাশ বলে আর এক লবণ থাকে। এ লবণ আবার সোরার

চেয়েও শীগগীর অক্সিজেন ছাড়ে। এই কোলরেটের আর এক কীর্ত্তির কথা বলি, শোন। গুঁড়ো চিনি আর এই কোলরেট এক সঙ্গে মিশিয়ে রেখে যদি তার উপর সাবধানে দূর থেকে এক ফোঁটা গন্ধকের তেজাব ফেলে দাও, ত তৎক্ষণাৎ দপ্ করে সবটা জ্বলে উঠবে।

এই যে সব বারুদের মতন জিনিস, এদের বন্ধ জায়গায় রেখে জ্বালালে, তবে তার জোর বোঝা যায়। নারকেলের খোলে পুরে আগুন দিলে, ভীষণ আওয়াজ হয়ে খোল ফেটে যাবে। নলের ভেতর পুরে নলটার এক দিক্ খোলা রাখলে ফোঁস্ করে সমস্ত গরম ধোঁয়া সেই দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে, আর যাবার সময়ে নলটাকে ভীষণ জোরে পেছনে ধাক্কা মারবে। হাউই-বাজী ওড়ে, চরকীবাজী ঘোরে ত এই জন্য! আনাড়ী লোকে বন্দুক ছুঁড়তে গিয়ে এই ধাক্কা খেয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ে যায়।

আচ্ছা, দেওয়ালীর বাজীতে নানা রঙ্গের আলো বেরোয় দেখেছ ত! সেটা কি করে হয়? এক একটা ধাতুর এক এক রঙ্গ আছে। যে ধাতুর লবণ তুমি বারুদে মেশাবে, সেই ধাতুর রঙ্গ আগুনে দেখা যাবে। তোমার কয়লার উনোনে এক চিম্টে তুঁতে-গুঁড়ো ফেলে দাও, দেখবে যে, কি সুন্দর নীল সবুজ রঙ্গের আলো বেরোবে! সোডা-গুঁড়ো ফেলে দাও, হলদে রঙ্গ হবে। চা-খড়ির গুঁড়ো ফেল, লালচে আলো হবে।

সচরাচর আগুনে কেন আলো হয়, হাইড্রজেন পোড়ালে কেন হয় না, বলতে পার। আলো করতে হলে যে কিছু পোড়াতেই হবে, এমন ত নয়! বিজলী বাতি দেখ না! তার বল্বের

ভেতরে ত অক্সিজেন নেই, সেখানে কিছু পুড়তেও পারে না। অথচ রোশনাই যত চাও, তত পাবে তার থেকে। কি হয় জান বিজলী বাতির বল্‌বের ভেতর? কাচের মধ্যে যে সরু তারের কুণ্ডলী আছে, সেটা বিজলীস্রোতের তাপে প্রথমে লাল হয়ে ওঠে, তার পর আরও বেশী তাতলে সাদা হয়ে আলো দেয়।

সেকরার কি কামারের হাপর দেখেছ তোমরা? হাপরে যত হাওয়া খাওয়াবে, চুলোর আগুন তত বেশী তাতবে। আঁচ যত বাড়বে, আগুনের আলো তত কমবে। কারীগর চুলো জ্বালে তাপের জন্য, রোশনাইয়ের জন্য ত নয়! তাই সে তার আগুনকে যত পারে অক্সিজেন খাইয়ে গরম করে তোলে।

এটাও নিশ্চয় তোমরা দেখেছ, যে পাথুরে কয়লার উনোন ভাল করে ধরলে তাতে আঁচ খুব হয়, কিন্তু আলো প্রায় বেরোয় না। শুকনো পাটকাঠির আগুনের আঁচ অত্যন্ত কম। তার উপর চারটী ভাত ফুটিয়ে নিতে হিম-শিম খেয়ে যেতে হয়। কিন্তু তার রোশনাই খুব। এইবার ভেবে দেখ, আলোর এই কম বেশী হয় কেন? মোট কথা এই যে, বিজলীর বাতিতে যে জন্য আলো বেরোয়, অন্য আগুনেও তাই। অঙ্গারের কণা-গুলো তেতে গনগনে হয়ে উঠে আলো দেয়, অক্সিজেন খাওয়ার সময়ে বিশেষ আলো দেয় না।

এটা সহজেই পরখ করে দেখতে পার। সন্ধ্যাবেলায় ঘরের দোর বন্ধ করে বসে, একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে তার শিখাটা নজর করে দেখ, সব বুঝতে পারবে। মোমবাতির উপরটা গলে একটা বাটির মতন হয়ে গেছে। সেই বাটির ভেতর মোম গলে গলে

আসছে, আর পলতেটা সেই গলা মোম শুষে নিয়ে আগুনের খোরাক জোগাচ্ছে। শিখার গড়ন ত দেখছ, একটা লঙ্কার মতন। এর সব জায়গায় কি সমান আঁচ? মোটেই না। উপরের শীষটা ত ভুসো। এক টুকরো কাগজ তার উপর ধরলে ভুসো পড়বে। আগুন চট করে ধরবে না।

এইবার নীচের মোটা ভাগটার দিকে নজর কর। দেখবে, লঙ্কার যেমন খোসা থাকে, তেমনি এরও চারিদিকে একটা খুব ফিকে নীল আলোর খোসা। এই আলোর রঙ ফিকে নীল, সেকরার হাপরের আগুনের মতন। তার মানে, ঐখানটায় খুব অক্সিজেন পাচ্ছে বলে মোমের কণা পুরোপুরি জ্বলে যাচ্ছে। ঐ খোসাটাতে কাগজের টুকরো ধরলে দপ্ করে জ্বলে উঠবে, কেন না ওর আঁচ খুব বেশী।

এই খোসার ভেতরেই ঝক্‌ঝকে হলদে আগুন। অঙ্গারের কণা তেতে গনগনে হয়ে রয়েছে। অক্সিজেন পাচ্ছে না, তাই পুড়ে ধোঁয়া হয়ে যাচ্ছে না। একটা বাঁকা পেতলের কি লোহার নল নিয়ে আস্তে ভেতরে ফুঁ দিলে, পুড়তে আরম্ভ হবে, আলোও কমে যাবে। শিখার এই হলদে আগুনটা কিন্তু ফাঁপা। একেবারে মাঝখানটায় আছে খানিকটা গ্যাস, জ্বলবার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু অক্সিজেন কোথায়! তুমি ইচ্ছা করলে, এই গ্যাসটা বাইরে বার করে আগুন ধরাতে পার। একটা সরু লোহার নল শিখার মাঝখানটায় ঢুকিয়ে দাও। তাই দিয়ে এই গ্যাস বেরোবে। দেশলাই ধরাও নলের মুখে, দিব্যি আর একটা আলো জ্বলবে।

নানা কথা

দীপশিখার বিষয়ে আমি যা বললাম—বাহিরে নীল আলোর খোসা, তার ভেতরে তেতে গনগনে অঙ্গার-কণা, আর মাঝখান-টায় কাঁচা গ্যাস—এটা তোমরা আর এক রকমে যাচিয়ে নিতে পার। একটা সাদা কাগজ নিয়ে খুব অল্পক্ষণের জন্য শিখার পেটের ভিতর ধর। চট্ করে কাগজটা বার করে নিলে দেখবে যে, তাতে একটা গোল আংটীর মতন পোড়া দাগ, তার ভেতরেই আর একটা গোল ভুসো পড়ার দাগ, আর মাঝখানটায় যেমনকার তেমনি সাদা।

তা হলে এটা ঠিক বুঝলে ত, যে আগুনের যত তাপ, তত কম আলো! যেখানে আলোর দরকার নেই, কিন্তু বিস্তর তাপ চাই, যেমন চুনের ভাটি, ইটের পাঁজা—সেখানে এমন ব্যবস্থা করতে হয় যে সব ভাগেই খুব হাওয়া মেলে, অর্থাৎ সর্ব্বত্র প্রচুর অক্সিজেন পায়।

এর চেয়েও ভীষণ তাপ না পেলে আবার লোহা ইত্যাদি ধাতুর কাজ হয় না, তাই সেখানে হাপরের ব্যবস্থা। আবার তার চেয়েও বেশী আঁচ যেখানে দরকার, সেখানে ভাটিতে খাঁটি অক্সিজেন জোগাতে হয়, আকাশের হাওয়াতে কাজ হয় না।

মাটির বাসন, কাচ, এ সব তৈরী করার জন্য খুব বেশী তাপের প্রয়োজন নেই। খুব বেশী তাতলে বাসন-কোসন ফেটে যাবার ভয় আছে। তাই ও রকম চুলোতে সাবধানে আঁচ কম-বেশী করবার ব্যবস্থা থাকে। কাচ তৈরী হয় সিলিকা আর সোডা একত্র গলিয়ে। তাইতে একটু কাচের গুঁড়ো মিশিয়ে দিলে কাজটা আরও সহজ হয়। সিলিকা মানে পরিষ্কার বালি আর

সোডা মানে বিশুদ্ধ সাজিমাটি। কাজেই মোটা-মেঠো কাচ তৈরী করার মশলা তোমাদের হাতের গোড়াতেই আছে। সোডার বদলে পটাশও ব্যবহার হয়। কালি নামে সমুদ্রের এক রকম পানা আছে, তার ছাই থেকে পটাশ সংগ্রহ হয়। বেনের দোকানে কিনতে পাওয়া যায়।

সাধারণ মাটির বাসন, যা আমাদের কুমোরেরা গড়ে, তা ত তোমরা সবাই দেখেছ! কেওলীন নামে এক রকম সাদা মাটি পাওয়া যায়, তাই দিয়ে যে বাসন তৈরী হয় তাকে, চীনে-মাটির বাসন বলে। তার উপর এক পরদা কাচ বার্ণিসের মতন লাগান থাকে, তাই দেখতে খুব সুন্দর চকচকে হয়। এইটুকু পড়েই কিছু তোমরা চীনে-মাটির থালা-বাটি তৈরী করতে পারবে না। তবে তোমাদের নজর সকল দিকে যায়, এই আমার ইচ্ছা।

রসায়নের আর একটা কথা শুধু বাকী আছে। সে সম্বন্ধে অল্প একটু বলে শেষ করব। এটা তোমরা নজর করেছ ত, যে অনেক জিনিস আছে, যার ভেতরটা কি সুন্দর দানা-বাঁধা! হীরার কথা ত আগেই বলেছি, যে কয়লা বই ওতে অন্য কিছু নেই। অথচ কি সুন্দর, ঝকঝকে, পল-কাটা পদার্থ এই হীরা, আলো যেন দশ দিকে ঠিকরে বেরোয়! লোকে ওর জন্যে পাগল হবে আশ্চর্য্য কি! আবার দেখ, চিনি আর মিছরী জিনিস একই, কিন্তু মিছরী দানাদার বলে দেখতে কত চমৎকার! সাধারণ নুন আর দানাবাঁধা সৈন্ধব নুন, এদেরও কত চেহারার তফাৎ! তুঁতে, সোরা, ফটকিরি, তিনটেই দানাদার জিনিস। হীরা ছাড়াও নানা রঙের সুন্দর সুন্দর জহরৎ আছে, যেমন চুনি,

পান্না, নীলা ইত্যাদি। এরাও সব দানা-বাঁধা পদার্থ। এদের কদর, সুন্দর রঙের জন্যও যতটা, চমৎকার দানাদার গড়নের জন্যও ততটা।

বরফের ভেতরটাও মিছরী-ফটকিরির মতন দানাদার, তা জান ত! হাতুড়ী মেরে ভাঙলে, ভেতর থেকে কত পল-কাটা কাচের মতন টুকরো বেরোবে। এই রকম গড়নের জন্য একটা খুব আশ্চর্য্য ব্যাপার আমরা দেখতে পাই। জল জমে ত বরফ হয়! তা হলে জলের চেয়ে বরফ বেশী ভারী হওয়া উচিত। কিন্তু সত্যি তা নয়, কেন না বরফ জলে ভাসে। কেন এ রকম হল, বল দেখি! ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বাঁধল, অথচ হয়ে গেল হালকা! এর কারণ ওই দানা বাঁধা। দানা বাঁধবার সময়ে ভেতরে অনেক ছোট ছোট ফাঁক রয়ে গেল, জিনিসটা তাই ফেঁপে উঠল। নিরেট পদার্থ হলে বরফ নিশ্চয় জলে ডুবত।

আমার রসায়নের কথা ফুরাল। হয়ত তোমাদের পক্ষে একটু শক্ত হয়ে গেল। কিন্তু যেখানে বিষয়টাই কঠিন, সেখানে আর কত সহজ করে বোঝাব? পদার্থের ভেতর অণু-পরমাণুর খেলার কথা কতকটা বুঝলে ত!

বিজ্ঞানের ধারা

প্রকৃতির কথা সংক্ষেপে গল্পচ্ছলে তোমাদিকে বললাম। সব কথা হয় ত তেমন সহজ ভাবে বলতে পারি নেই। তবু বইখানা কষ্ট করে পড়লে, জড়-জগৎ সম্বন্ধে তোমাদের মোটামুটি একটা ধারণা হতেই হবে। তার পর, যার ইচ্ছা সে আরও বড় বই পড়তে পারবে। একটা গোড়াপত্তন ত হয়ে রইল!

আমি যে যে বিষয়ে তোমাদের কাছে কথা কইলাম, তার একটা নাম দেওয়া হয়েছে, বিজ্ঞান। বিজ্ঞান আর জ্ঞানে তফাৎ বিশেষ কিছু নেই, তবে বিজ্ঞানে কেউ এলোমেলো চিন্তাকে আমল দেয় না। ভগবানের সংসারে এলোমেলো ব্যাপারের স্থান নেই। যা কিছু ঘটনা ঘটে, সবই নিয়মের ফলে। বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে, সেই নিয়ম-কানুনগুলো খুঁজে বার করা। যুগ-যুগান্তর ধরে মানুষ এই নিয়মগুলোর সন্ধান করছে। আজকের দিনে কারও চোখ বুজে বসে থাকলে ত চলবে না! অন্যের উপর মাদার দিয়ে হাত গুটিয়ে যে বসে থাকবে, সেই ঠকবে।

আমি যা যা বলে এসেছি, তার থেকে তোমরা নিশ্চয় বুঝেছ, যে একটা কি দুটো ঘটনা দেখে লাফিয়ে উঠলে প্রকৃতির নিয়ম

ধরতে পারা যায় না। ও রকম লাফিয়ে ওঠে পশু-পক্ষী। মানুষের মাথায় ঠাকুর মগজ দিয়েছেন, সব বিষয় বিবেচনা করে দেখবে বলে। একটা প্রবাদ আছে না, ঘর-পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘকে ডরায়! সে ডরায়, গরু ব'লে। মানুষ সিঁদুরে মেঘকে আগুন মনে করে পালাবে কেন? একবার না হয় ঘরে আগুন লেগেছিল, তাই বলে লাল দেখলেই আগুন ভাববে! তা যদি ভাবে, ত বলতে হবে, লোকটার গরুর মতন বুদ্ধি!

ধর, তুমি আকাশে রামধনু দেখলে। একবার, দু বার, দশ বার দেখলে! প্রত্যেক বারই তোমার নজরে পড়ল যে আসমানে মেঘ, রোদ, দুই না থাকলে এ জিনিস দেখা যায় না। তার পর একদিন কুলকুচো করতে করতে দেখলে যে, তোমার মুখের জলেও ঐ রকম সাত রঙ্গ ফুটে উঠল। তখন আরও কয়েক বার মুখের জল উড়িয়ে পরখ করে নিলে যে—হ্যাঁ, জলের ফোয়ারায় রোদ পড়লেই সাত রঙ্গ দেখা যায়। কিছুদিন পরে কোন বড় লোকের বাড়ী যাত্রা শুনতে গিয়ে দেখে এলে, যে ঝাড়লণ্ঠনের কলমেও আলো পড়ে ঐ রকম সাত রঙ্গ ঝলমল করছে। একটা ভাঙ্গা কলম সংগ্রহ করে বাড়ী এসে তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আলো ফেলে বুঝলে, যে প্রত্যেক বার সূর্য্যের কিরণ কলমের উপর পড়ে আর ও-পাশে সাত রঙ্গ হয়ে বেরোয়। তার পর, দেওয়ালে সেই সাত রঙ্গ ফেলে বেশ করে তাকে দেখলে। হ্যাঁ, রামধনুর রঙ্গই ত বটে! তখন তোমার বিশ্বাস হল যে, রামধনু একটা আজগুবি জিনিস কিছু নয়, সূর্য্যের সাদা আলো ভেঙ্গে ঐ সাতটা রঙ্গ হয়—এই প্রকৃতির নিয়ম। এখানে কিন্তু তুমি থামলে চলবে না। নিয়মটা

যাচিয়ে দেখতে হবে! দেখা যাক্, সাত রঙ মিশে আবার সাদা হয় কি না! আর একটা ঝাড়ের কলম উলটে ধরে, তার উপর তোমার ছোট্ট রামধনু ফেললে। দেখবে, সেটা ও-পাশে সাদা হয়ে বেরোল। সাত-রঙা লাট্টু ঘুরিয়েও দেখে নিলে, যে জোরে লাট্টু ঘুরলেই সাদা দেখাচ্ছে।

তখন তুমি জোর করে বলতে পারলে, "কি রামধনু-ইন্দ্রধনু করেন, মশায়! বৃষ্টির জলে রোদ পড়ে ঐ রকম সাত রঙ হয়, আমি জানি। রঙগুলো সব সূর্য্যের সাদা আলোর ভেতরেই আছে।"

এতে তুমি নাস্তিক হয়ে গেলে, তা ত নয়! ভগবানের গৌরব এতে এতটুকু ক্ষুণ্ণ হল না। বরং তাঁর নিয়ম বুঝতে চেষ্টা করে, তুমি তাঁর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা বেশী দেখালে।

এই হচ্ছে বিজ্ঞানের সাধনা। সব ঘটনা, সব ব্যাপার, এই রকম যাচিয়ে দেখলে সত্যি কারণ, সত্যি নিয়ম, মানুষের চোখে পড়ে। নইলে অন্ধের মতন থাকলে, যা তা বিশ্বাস করলে, চিরদিনই লোকে তোমাদিকে ভোগা দেবে।

আমি জানি, তোমাদের শিক্ষা কম বা বয়স কম, বিজ্ঞানের পরীক্ষা করে দেখবার, শেখবার মত সুযোগ তোমাদের নেই। তবু যতটা পার, পড়ে শুনে সব জিনিস বুঝতে শেখ। সকল মানুষই কিছু কাপড়ের দর জানে না। কিন্তু দর না জানলে একটা ভাল দোকান ঠিক করে রাখতে হয় ত, যেখানে দোকানী আনাড়ী খদ্দেরকেও ঠকায় না!

বিজ্ঞান কাউকে ঠকায় না। কেন না তার নিয়ম-কানুন বার বার যাচিয়ে নেওয়া হয়েছে, এখনও হচ্ছে। যেই কোন

জায়গায় একটা নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা গেছে, কি তৎক্ষণাৎ সে নিয়মকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। তাপ সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা কি রকমে, কেন, মত বদলে ফেলেছেন, তা তোমাদিকে বলেছি। পরমাণুর সম্বন্ধেও পূর্ব্বের মত পণ্ডিতেরা এখন ত্যাগ করেছেন। আর কেউ বলে না যে পরমাণুকে ভাগ করা যায় না। এও তোমাদের বলেছি।

বিজ্ঞানে আর সংস্কারে এই মত তফাৎ। ধর, তুমি বাড়ী থেকে কোন জরুরী কাজে বেরোচ্ছ, এমন সময়ে হাঁচি পড়ল। তোমাকে কেউ বললে, "ওহে, আজ আর বেরিও না। বাধা পড়ল।" তুমি ভয়ে বেরোলে না, বাড়ীতেই বসে রইলে। কেন এ রকম করবে তুমি? হাঁচি পড়ার সঙ্গে তোমার কার্য্যসিদ্ধির কি সম্পর্ক, কেউ তোমাকে আগে বুঝিয়ে দিক এ কথা। তার পর, যদি যাচিয়ে দেখ যে, প্রত্যেক বার হাঁচি পড়ার ফলে বিঘ্ন হচ্ছে, তখন এ বাধা-বিঘ্ন মেনো, আমি আপত্তি করব না। কিন্তু নিজে চোখে দেখে যাচিয়ে নেওয়া চাই। অমুকের কাকার কি অমুকের পিসীর কি লোকসান হয়েছিল, সে সব গাল-গল্প শুনে ভড়কে গেলে হবে না। সত্যি বিপদ জগতে এত আছে, যে তার উপর আবার পাঁচ রকম জুজুর ভয় চাপিয়ে দিলে সংসারে বাস করাই দুষ্কর। জুজুর ভয়ের প্রধান দাওয়াই হচ্ছে, বিজ্ঞান। তারই খুব ছোট্ট একটা [illegible] আমার এই ক্ষুদ্র বইখানি।